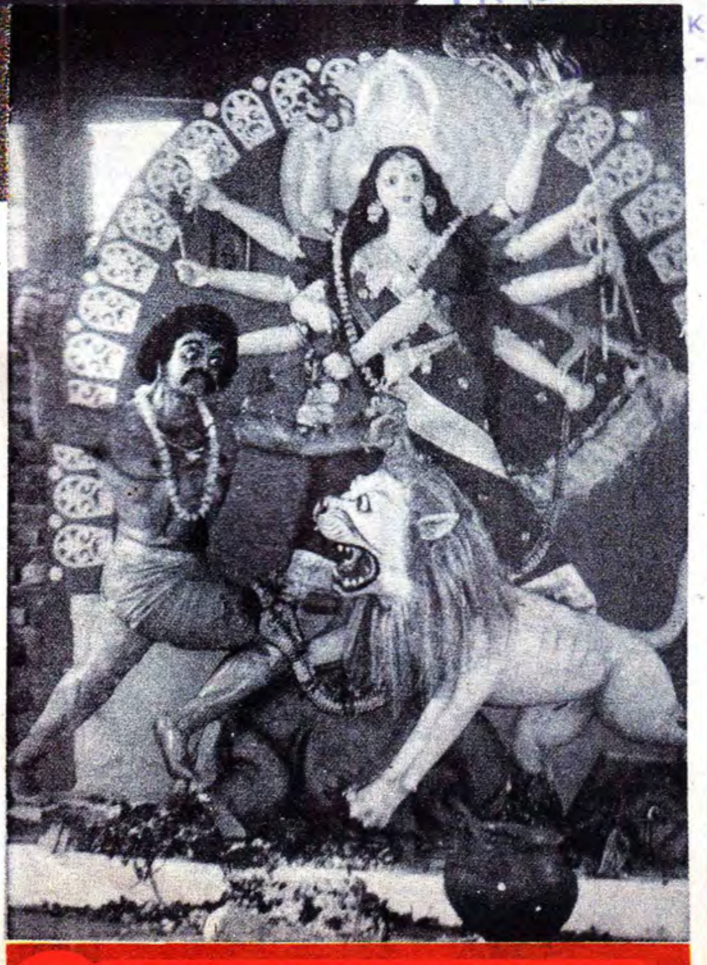
পরিবর্তন

২০ নভেম্বর ১৯৮৫





পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) কি ভাঙনের মুখে ?

নেমা হলে তরুণী-হত্যার
নেপথ্য কাহিনী



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

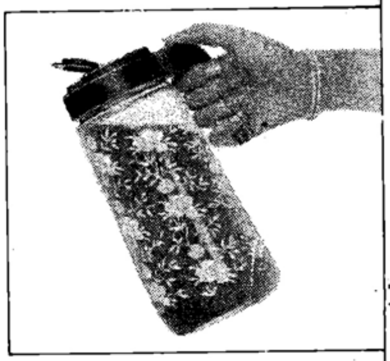
এখনই কিনুন!

আপনার পরিবারের প্রিয় হরলিক্স এখন পাবেন এক দারুণ সুন্দর জাগে।

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



বিশেষ ১ কিলোর প্যাক।



এই সুযোগ কোন সুগৃহিণীই ছাড়তে পারবেন না– হরলিক্স-এর নতুন ১ কিলো জাগ্।

আপনার পরিবারের সকলকে শক্তিদায়ী হরলিক্স দিন। জার খালি হয়ে গেলে মোড়কটি খুলে ফেলুন। বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ক্যাপসহ এই নতুন জাগ্ সত্যিই দারুণ। হ্যান্ডেলটি ধরতে সুবিধে। এবং জাগের গায়ে ফুলকাটা ডিজাইন এতো সুন্দর যে আপনার পছন্দ হবেই হবে। এই জাগে আপনি যে কোন পানীয় পরিবেশন করতে পারেন।

১ কিলো সাধারণ জারের দামের তুলনায় মাত্র ৩ টাকা ৫০ পয়সা বেশি। হরলিক্স-এর তরফ থেকে এটি আপনার এক দারুণ সওদা!

তাড়াতাড়ি!

ষ্টক শেষ হবার আগেই কিনুন।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এই সুযোগ পাওয়া যাবে।

হরলিক্স

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

★★★★★★★★★★★★

HMM-8763

পরিবর্তন

২০–২৬ নভেম্বর ১৯৮৫, বর্ষ ৮, সংখ্যা ২১

প্রতি সংখ্যা ৩ টাকা

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা



সিনেমা হলে নারী-হত্যা



লাশ নিয়ে রাজনীতি



বাংলাদেশে দুর্গাপুজো

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের ফটো :

রঙিন ছবি : সৌগত রায় বর্মন

সাদা-কালো : স্বপন কুমার সাহা

প্রধান উপদেষ্টা : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭২

চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ : সি এইচ বসু, কলকাতা

দিল্লি অফিস : জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন : ওয়াই এ শেঠি। জনসংযোগ : শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি ১১০ ০০১, ফোন : ৩৩১-৭০২৪

দিল্লি সংবাদদাতা : সুজিত রায়

বোম্বাই প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি : ফ্ল্যাট নং ১, বিল্ডিং নং ৪, টুইনকল স্টার কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, চেমবুর, বোম্বে ৪০০ ০৭১, ফোন : ৫৫১-৬২৬২, ৫৫১-০৫৯২

নিবেদনমিদং

আগামী ৩ ডিসেম্বর কলকাতার শেক্সপিয়র সরণিতে ভারতীয় ভাষা পরিষদ হলে আমাদের যে মিলন উৎসব হচ্ছে, সে সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। অনেকে আমন্ত্রণপত্রের জন্য চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা ও শহরতলীতে মৈত্রী সংঘের সদস্য, পরিবর্তনের লেখক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা যাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চান, তাঁদের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিজেদের এসে যীশু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আমন্ত্রণপত্র নিয়ে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ভাষা পরিষদ হলে জায়গা অত্যন্ত কম। সেইজন্যই এই আমন্ত্রণপত্রের ব্যবস্থা। তাছাড়া এটি একান্তভাবেই পরিবর্তন-এর পাঠকদের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের কর্মসূচী— ১টা-২টা : মৈত্রী সংঘের সদস্যদের সভা, ২টা-৩টা : অপসাংবাদিকতা সম্পর্কে আলোচনাচক্র, ৩টা-৫টা : পরিবর্তন পুরস্কার বিতরণ ও পূজা সংখ্যার শব্দশৃঙ্খল-প্রতিযোগিতার সকল উত্তরদাতাদের সার্টিফিকেট বিতরণ। এই অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পরিবর্তন-এর পাঠকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ পরিবর্তন পুরস্কার দেবেন। এরপরে একটি ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই অনুষ্ঠান নিয়ে মোটামুটি আমরা সবাই খুব ব্যস্ত। এছাড়া ব্যস্ততা আরো অন্য কারণে। নতুন বছর থেকে আমরা পরিবর্তন-এর অঙ্গসজ্জার কিছু কিছু পরিবর্তন করছি। পরিবর্তনকে কীভাবে আরো জীবনের মুখোমুখি নিয়ে আসা যায় সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছি।

যুবমন বিভাগটি সম্পর্কে আমরা খুবই আশা পোষণ করি। আপনারা বোধহয় দেখেছেন যে, এই বিভাগে আমরা তরুণ প্রতিভা বলে একটি বিভাগ করেছি। তিরিশ বছরের নিচে যেসব তরুণ-তরুণী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন, তাঁদের সন্ধান আপনারা যে কেউ দিতে পারেন। ছবি দিয়ে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠান।

কোন তরুণ-তরুণী কোন ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়ে থাকলে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য অথবা পরামর্শের জন্য আমাদের চিঠি লিখুন।



পরিবর্তন অফিসে মাঝে মাঝেই দেশবিদেশের অতিথিরা আসেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, ইত্যাদি প্রকাশনী ম্যাগাজিন প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা। এমনই একজন অতিথি গত ৮ নভেম্বর আমাদের অফিসে এসেছিলেন। তিনি হনলুলুর ইস্ট-ওয়েস্ট কমিউনিকেশন ইনস্টিটুট-এর ডিরেক্টর ডঃ মেরি বিটারম্যান। তাঁকে নিয়ে বসেছিল এক আলোচনার আসর। এই আলোচনা-সভায় আমাদের কর্মীরা ছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা এবং সাংবাদিকতা বিভাগের কর্মীরা।

সবশেষে আবার জানাই ৩ ডিসেম্বরের মিলন উৎসব পরিবর্তন-এর সম্পাদকীয় দফতরের কর্মী ও পাঠকদের মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনা করার জন্যই আয়োজিত হয়েছে। পরিবর্তনকে যাঁরা ভালবাসেন এই উৎসবের আমন্ত্রণলিপি সংগ্রহ করতে তাঁরা ভুলবেন না।

অলমিতি

পা. চ.

পরিবর্তন ২৭ নভেম্বর সংখ্যার আকর্ষণ

বিয়ের মরশুম আবার শুরু হয়েছে। পরিবর্তন এই মরশুম উপলক্ষে প্রকাশ করছে বিয়ের ওপর একগুচ্ছ রচনা। সেইসঙ্গে প্রকাশিত হল মুসলিম বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি রচনা ও একটি সাক্ষাৎকার :

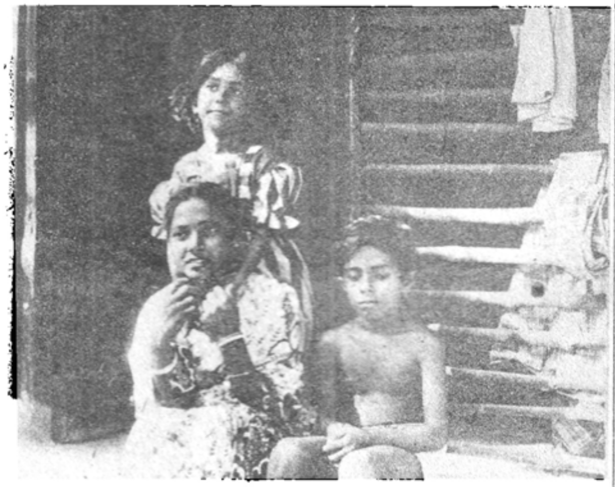
অল্প খরচে বিয়ে

ও বিবাহ সম্পর্কে বিচিত্র রচনা

★ ★ ★

চম্বলের অন্যতম এক ডাকাত-দলের নেত্রী ফুলন এখন গোয়ালিয়রের কারাগারে রয়েছেন। তিনি মধ্যপ্রদেশ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তার সেই আত্মসমর্পণের পর দুই প্রতিবেশী রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এবং রাজনীতিকদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে যায়! কেন এই সংঘাত? তারই নেপথ্য কাহিনী ও পটভূমি বর্ণনা :

ডাকাতনেত্রী ফুলনকে ঘিরে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ পুলিশে বিরোধ তুঙ্গে



মেদিনীপুরের একটি অঞ্চলে কয়েকজন পতিতাকে সমাজে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালান স্থানীয় একটি মহিলা সমিতি ও অন্যান্য কয়েকজন সমাজসেবী। কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়ান অনেকেই। তবু চেষ্টার বিরাম নেই তাদের সুস্থজীবনে ফিরিয়ে আনার। তারই মানবিক কাহিনী

পতিতারা সমাজে ফিরে আসছেন

★ ★ ★

এছাড়া অন্যান্য আকর্ষণীয় লেখা

এবং নিয়মিত ফিচার

সম্পাদকীয়

কিছুকাল আগে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র সাংবাদিকদের শায়েস্তা করবার জন্য একটি বিল নিয়ে আসেন যা বিহার প্রেস বিল নামে কুখ্যাত ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে সকলেই প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশেষে প্রতিবাদের তোপের মুখে সমগ্র বিলটি যে প্রত্যাহৃত হয় তা সকলেরই জানা। অন্ধ্রের তেলুগু দেশম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামা রাও জগন্নাথ মিশ্রের মত সম্ভবত 'নিরেট' নন। সংবাদপত্র-বিরোধী কোন বিল এনে তিনি রাতারাতি বিতর্কের মুখে পড়তে চান না। কোন সাংবাদিককে যদি তাঁর 'না-পসন্দ' হয় তাহলে তিনি তাঁর কণ্ঠ কীভাবে রোধ করতে হয় তা জানেন। সম্প্রতি তেলুগু পাক্ষিক এনকাউণ্টার-এর সম্পাদক ইঙ্গালি দশরথ রাম রহস্যজনকভাবে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। দশরথ রামের অপরাধ, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কন্যার কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কথা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রকন্যারা যে পবিত্র 'গোধন' এবং তাঁদের সম্পর্কে কিছু লেখা যে 'গোস্তাকি' এবং সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ তা আমরা এই রাজ্যের সাংবাদিকরা হৃদয়ঙ্গম করলেও 'দুর্বিনীত' দশরথ রাম উপলব্ধি করেননি। এই জন্যেই কি দশরথ রামকে গুণ্ডার ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে হয় ?

এই ঘটনার সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কোন যোগ আছে একথা বলার মত আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই। কে, কখন, কাকে, কার নির্দেশে হত্যা করে তা বিচারের অধিকার একমাত্র ধর্মাধিকরণের তবে বিচারের বাণী প্রায়শই নীরবে নিভৃতে কেঁদে থাকে। আহত দশরথ রামের দেহটিকে বিনা চিকিৎসায় থানায় রেখে দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করে না। খবরের কাগজে এই হত্যাকাণ্ডের কথা ফলাওভাবে প্রকাশিত হবার পর পরবর্তীকালে পুলিশি তদন্ত শুরু হয় এবং একজন লোককে নাকি গ্রেফতারও করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন যদি একজোট হয় তাহলে হত্যা অপরাধে ধৃত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার সময় তারা আইনের ফাঁকফোকর রেখে দিতে পারে প্রশাসন যদি হত্যা চায় তাহলে সে হত্যাকারীকে আর পায় কে ! পশ্চিমবঙ্গে বহু রাজনৈতিক খুনীকে আদালত দণ্ড দেওয়ার পরেও শাসক দল ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। পাঞ্জাবে অকালি সরকার এসে খুনীদের ছেড়ে দিচ্ছেন। আইনের মত খুনও তাই তামাশা মাত্র। শাসকদলের এক অঙ্গুলি-হেলনে খুনীরা যেকোন কাজ নিঃশব্দে সমাধা করে ফেলতে পারে।

ভারতবর্ষে সাংবাদিক খুন এই প্রথম নয়। কিন্তু আর যাই হোক, এর আগে কোনদিন অভিযোগ ওঠেনি যে, ব্যক্তিগত কেচ্ছা লেখার অপরাধে একজন মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক খুনের ব্যাপারে জড়িত। ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাস প্রশাসনের সঙ্গে সাংবাদিকদের লড়াইয়ের ইতিহাস। ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার জনক জেমস অগস্টাস হিকি তৎকালীন প্রশাসন-অধিকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পত্নীর কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী ফাঁস করে দেন বলে তাঁকে রাজরোষে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত হিকি দীর্ঘকাল জেলে কাটান এবং সর্বস্বান্ত হন। কিন্তু হেস্টিংস সাহেব হিকিকে প্রাণে মারেননি। যদিও সে যুগে সামান্য একজন জমিদারের পক্ষেও কোন প্রজাকে গুম করে দেওয়া সামান্যই ব্যাপার ছিল। আর হেস্টিংস তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু অন্ধ্রের ম্যাটিনি আইডল এবং ভারতে বিরোধী নেতাদের স্তম্ভ. গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী, যিনি নিজে গৈরিক বসন পরে থাকেন, তিনি যে এক সামান্য সাংবাদিকের এই করুণ পরিণতির জন্য সন্দেহভাজন হবেন তা বহু লোকেরই অজানা ছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে হত্যার আদেশ যিনি দেন তিনিও সমান অপরাধে অপরাধী। আমরা একথা বলতে চাই না যে, রামা রাও-ই হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু দেশের বহু মানুষ এ ব্যাপারে তাঁকে সন্দেহ করেন, সেহেতু এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তই একমাত্র সত্যতা নিরূপণের উপায়।

সাত-পাঁচ

পুলিশও মরেছে তাদের হাতে

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান নিয়ে এখন বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারাও চিন্তিত। উচ্চতর কয়েকটি বিশ্ব সম্মেলনে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। আলোচনা হয়েছে এমনকী কোন কোন শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে। তবু এ পাপ দূর করা যাচ্ছে না।

কেন এই অক্ষমতা ? প্রথম কথা মাদকদ্রব্যের চোরা-চালানকারীরা টাকা পয়সার দিক থেকে রীতিমত ধনশালী। লোকবলও ভয় ধরিয়ে দেবার মত। পৃথিবীর সর্বত্র এই চোরাচালানকারীরা অবাধে ঘুরে বেড়ায়। শোনা যায়, তারা নিজেদের প্রশাসন নিজেরাই চালায়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই অপকর্মের প্রমাণ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এসব দেশে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের কারো কারোর মধ্যে তাদের প্রভাব আছে বলে অনেকেরই অভিমত। আর সেজন্য প্রশাসনিক প্রতিরোধ এলে চোরাচালানকারীরা আগে থেকেই সে খবর পেয়ে যেতে পারে। বলা যেতে পারে, কোন কোন দু'দে অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসকেও হার মানায় তাদের কার্যকলাপ।

সম্প্রতি মেক্সিকোর পূর্ব প্রান্তীয় রাজ্য ভেরাক্রুজে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। সেখানকার পুলিশ খবর পায়, মারিজুয়ানা চোরাচালানকারী একটি গোষ্ঠী ঐ অঞ্চলে সক্রিয়। ফলে তারা অঞ্চলটি ঘিরে ফেলে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করে। কিন্তু শুরু করার মুহূর্তেই তাদের ওপর আক্রমণ আসে। ফলে পুলিশ গুলি চালায়। কয়েক ঘণ্টা ধরে গোলাগুলি চলে উভয়পক্ষে। অপরাধীদের গুলিতে ২১জন পুলিশ মারা যান। তার মধ্যে কয়েকজন কেন্দ্রীয় পুলিশ অফিসারও আছেন।

একুশজন পুলিশকে যারা সামনাসামনি লড়াইতে সাবাড় করে দিতে পারে তাদের ক্ষমতা তাহলে এবার মেপে নিন।

তালাক-এর বিরুদ্ধে

প্রায় ৩৫জন মুসলমান নারী ও পুরুষ সেদিন কোলাপুরের রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। এই গোষ্ঠীর নেত্রী ছিলেন মেহেরুন্নিসা দালওয়াই। এছাড়া ছিলেন হুসেন জামদার। সারা মহারাষ্ট্র রাজ্য জুড়ে 'তালাক মুক্তি মোর্চা' যে তালাক-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে এই জমায়েত ছিল তারই অন্তর্গত। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হুসেন জামদারের মতে, এই জমায়েত একটি সমাজ সংস্কারক আন্দোলনের তুল্য। তাঁদের দাবি, 'তালাকের শিকল থেকে মুসলিম নারীদের মুক্তি দাও।'

এই তালাকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই স্থানীয় বিন্দু চকে শরিফা মোল্লা অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। তিনি নিজেও তালাকপ্রাপ্ত। তাঁর মতে, কোনভাবেই যেন শাহ বানু মামলা সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্ট-এর রায়কে বাতিল করা না হয়। কেননা এই রায় মুসলিম তালাকপ্রাপ্ত রমণীদের একটা বিরাট অবলম্বনস্বরূপ।

এই মোর্চার নারী ও পুরুষরা তালাকের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার জন্য বাসে করে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার পথ ঘুরবেন। তাঁদের পথে পড়বে মিরাজ, শোলাপুর, উসমানাবাদ, লাতুর, অম্বাযোগাই, পার্বণী, নান্দেদ, চন্দ্রপুর, অমরাবতী, বুলদানা, জলগাঁও, ঔরঙ্গাবাদ, আহমেদনগর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি।

মোলাইজ-এর মৃত্যু নেই

বোথা সরকার আর মোলাইজদের অ-রূপকথা

সে এক বড় সুন্দর রূপকথা। দক্ষিণ আফ্রিকা নামক এক দেশ, রাজধানী তার প্রিটোরিয়া। সেখানে বোথা সরকার রাজত্ব করেন। তাঁর কথা অমৃতসমান। এই মহানুভব সরকার চিরকালই দেশের জন্য, দশের জন্য বড় ভাবেন। তাঁর বড় লজ্জা, যন্ত্রণা আর বিবেকের তাড়না—মাত্র ত্রিশ লক্ষ সাদা মনের অধিকারী সাদা মানুষকে বেশি অধিকার দিতে হচ্ছে। অথচ দুকোটি তিরিশ লক্ষ কালো মানুষের ভালমানুষ হবার অপেক্ষায় তিনি রয়েছেন। কিন্তু মানুষগুলো কী অদ্ভুত! কিছুতেই ভাল হয় না! তার ওপর সাদা মানুষের সাদা মনের ওপর কাদা লেপনের কী অন্যায় প্রবৃত্তি? এদের অধিকার দিলে যে এরা তা রক্ষা রাখতে পারবে না, অপব্যবহারে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে দেশের মাথা হেঁট করে দেবে। ছিঃ! তা কি হতে দেওয়া যায়? মুক্তির সংগ্রাম? ছিঃ! একটা মুক্ত স্বাধীন দেশের জনগণের আবার মুক্তির সংগ্রাম কী? তোমরা তো সবাই স্বাধীন! শুধু যদি তোমরা একটু ভালমানুষ হয়ে ওঠ···

ঐ নেলসন ম্যাণ্ডেলা! কী যে বোকা না! কী সব অদ্ভুত মুক্তির সংগ্রাম-টংগ্রাম শুরু করেছিল! হাজার হোক দেশের ছেলে, তাই শুধরোবার জন্য জেলে দিতে হল। কিন্তু এতো হাঁদা, কিছুতেই সাদা কথাটা বুঝতে পারে না। পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর ধরন-ধারণও যেন কেমন! নাসাউতে কমনওয়েলথের শীর্ষ সম্মেলন চলছিল, সেখানে তারা বলে কিনা কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সুমতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হোক। সেই যে ইন্দিরা গান্ধীর দেশের লোকরা বলে না, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি! দেশের এই কালো ছেলেরা যে কী অবাধ্য তা ওরা কী করে বুঝবে! কার সাধ্য ওদের বাধ্য করবে! বোধহয় ইণ্ডিয়ান গড শিবের বাবারও অসাধ্য। বোথার এই হৃদয়ের যন্ত্রণা কেউ বুঝল না! সাদা ছেলেগুলো তবু বোঝে, কিন্তু কালোগুলো যেন মন কালো করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই জন্মায়! তবু বৃটেন সভ্য বলে যোগ্য সহবৎ দেখিয়েছে। ব্যবস্থাপত্রে সায় দেয়নি। তবে তাকেও সবার সঙ্গে চলতে হয় বলে ঐ একটা আবেদন-গোছের প্রস্তাব করেছে। বোথা সময় পেলে সেসব পড়ে দেখবেন-খন।

কিন্তু এখন যে হৃদয়ে বড় যন্ত্রণা! একটা তিরিশ বছরের কালো ছেলের অবাধ্যতার জন্য তাকে শাস্তি দিতে হল। বোথার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! কিন্তু দেশের আইন আর সারা দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তো এই হৃদয়বিদারক পদক্ষেপ নিতে হয়েছে! ও গ্রেসাস জিসাস, কালো মানুষগুলোর হৃদয়ে সামান্য বোধ দিয়ে তাদের ভালমানুষ করবে কবে? মাত্র তিরিশ বছর বয়স, টগবগে জোয়ান, উত্তেজনা থাকতেই পারে, কিন্তু সামান্য বিবেক থাকতে নেই? সে ছিল নাকি আবার কবি, কালো মানুষের মুক্তির জন্য কবিতা লিখত! এই জন্য মাঝে মাঝে বোথাকে বাইরে এত লজ্জায় পড়তে হয়! স্বাধীন দেশের নাগরিক কত নির্বোধ হলে যে এসব পাগলের প্রলাপ বকতে পারে! কবিতা লেখার কত বিষয় ছিল! সুন্দরী মেয়ের প্রতি প্রেম নিবেদন, মৃত প্রেমিকার উদ্দেশে বিলাপ, ফুলের পাপড়ি, নদীর জল, সাগরের বিশালতা, পাহাড়ের উদাসীন উচ্চতা কিংবা নিজের স্বপ্ন-টপ্ন ইত্যাদি কত বিষয় নিয়ে তো কবিতা লেখা যায়। কিন্তু কালো মানুষ যে সাদা জিনিস কোনদিন বোঝে না! দুকোটি তিরিশ লক্ষ এই কালো মানুষ ভালমানুষ না হলে যে দেশটা ক্রমশ গোল্লায় যাবে! ওহো! প্রিয় দেশের মাটি! ফিলিপস লেপাস নামক এক পুলিশ কনস্টেবলকে বেঞ্জামিন মোলাইজ কিনা খুন করে বসল! হায়! ভাই ভাইয়ের প্রাণ নেয় এইরকম নিষ্ঠুরভাবে? বোথা কত ভেবেছেন, শেষে বিনিদ্র রজনীর শেষে দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য যন্ত্রণাকাতর আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক আপাতনিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিলেন! এর পরেও কি কালো-মানুষগুলো ভালমানুষ হবে না! ও গ্রেসাস জিসাস!

বিশপ ডেসমণ্ড টুটু গত বছর শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সত্যি বড় আনন্দের খবর! কিন্তু এই বিজ্ঞ মানুষটাও বড় অবুঝ! উনিও আবেদন করেছিলেন মোলাইজের প্রাণ-ভিক্ষার! কিন্তু বোথা মনে কষ্ট পেলেও ঐ বিজ্ঞ মানুষটির অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। টুটু নিশ্চয় পরে চিন্তা করে দেখবেন দেশের স্বার্থে এই পদক্ষেপ কত দরকার ছিল। মোলাইজের মা বলেছেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখ হলেও তিনি গর্বিত। সত্যি কালো মানুষগুলোর চোখে সঠিক আলো কবে যে ধরা পড়বে! কালো মানুষগুলো বলছে—এই ফাঁসিতে নাকি তাদের মুক্তির সংগ্রাম ত্বরান্বিত হল। বোথা ভাবেন আর কষ্ট পান। তাঁর দেশের মানুষ কত অবুঝ। স্বাধীন মুক্ত দেশে মুক্তির সংগ্রামের গান গায় ঐ কালো মানুষগুলো! হায়! হায় গ্রেসাস জিসাস!

অলোক বসু
গোচারণ, ২৪ পরগণা

মোলাইজের মৃত্যুর পর

পৃথিবীতে মানুষ যত ভাষায় কথা বলে,
যত ভাষায় যন্ত্রণার ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ
প্রতিনিয়ত অনুভবের ব্যর্থ বাণীরূপ আনে
সেই সব ভাষায়—মোলাইজ—
তোমার কবিতার অনুবাদ
দমকলের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়ার মতই
জরুরী আজ। কেননা তোমার কবিতার
আগুন, বিধ্বংসী আগুন নেভাতে পারে।
আমরা তাই মানুষের মুখের অভিব্যক্তিতে,
জীবনযাপনের সৌন্দর্যে নিরূপম ভাস্কর্যের মত
গেঁথে যেতে চাই তোমার কবিতাকে,
যে কবিতা আমি আজও পড়িনি,
কিন্তু তোমার ফাঁসীর খবরে
কী নিবিড়ভাবে বুকের গভীরে
পেয়ে গেছি তাকে।

অমিত দে
কলকাতা-২৯

মোলাইজ-কণ্ঠ অমর হোক

১৮ অক্টোবর ১৯৩১। বিশ্ববন্দিত আবিষ্কারক 'টমাস আলভা এডিসন'-এর জীবনাবসান হয়।

১৯৮৫-তে প্রদত্ত হয় আর এক মৃত্যুদণ্ড। কৃষ্ণাঙ্গ এক কবির। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ঐ ১৮ অক্টোবর। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে জনগণকে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার অপরাধে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন বেঞ্জামিন মোলাইজ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন আমৃত্যু যে কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়েছে মুক্তি সংগ্রামের গান, মানবাধিকার আদায়ের কবিতা—সেই কণ্ঠস্বর বা দেশ-বিদেশের কবিদের কণ্ঠে মোলাইজ-এর কবিতা এডিসন আবিষ্কৃত ফোনোগ্রাফ অর্থাৎ গ্রামোফোন রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করার সম্মিলিত প্রয়াসের। যা কিনা গণ-সংগ্রামে প্রতিনিয়ত প্রেরণার সঞ্চার করবে এবং মোলাইজ-এর প্রভাব গণচিত্তে সুদূরপ্রসারী হবে এডিসন-উদ্ভাবিত যন্ত্রটির সার্থক প্রয়োগে। এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয় যে, এডিসনের এই



Glory
Godrej
চুল পরিচর্যা সম্পর্কে সমাচার
■ নতুন ক্রাউনিং গ্লোরী-র অগাধ ফেনা আপনার চুলে আনে রেশমী-স্বচ্ছতা। এটি মামুলি সাবানের মত চুলকে কান্তিহীন বা খসখসে করে না।
■ এর অতুলনীয় 'কণ্ডিশনার' চুলকে ঘন আর দীপ্তিময় বানায়।
■ এর মনমাতানো সুগন্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে যায়। আর, এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও এর দাম শ্যাম্পু-র তুলনায় অনেক কম!
■ তাছাড়া এক সৌন্দর্য সাবানও— যা আপনার কান্তিময় দেহকে ক'রে তোলে নরম ও মোলায়েম।
Godrej
CROWNING
Glory
BEAUTY SOAP
for silky hair
and complexion care
CG
নতুন
ক্রাউনিং
গ্লোরী
"কণ্ডিশনার" যুক্ত একমাত্র সৌন্দর্য-সাবান—
যা চুলকে নরম, দীপ্তিময় করে আর
আপনার আয়ত্তে আনে।

উদ্ভাবন ক্ষমতার সার্থকতম ঐতিহাসিক পরিণতি হবে মোলাইজ-এর সংগ্রামের বাণী এইভাবে সংরক্ষণ ও জনমত গঠনের মাধ্যমে।

দেবব্রত মুখার্জি
শিবপুর, হাওড়া

মোলাইজ-এর মৃত্যু প্রেরণা জোগাবে

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় কবি বেঞ্জামিন মোলাইজ-এর ফাঁসি হয়ে গেল গত ১৮ অক্টোবর। আমেরিকা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ, কমনওয়েলথ দেশগুলি; সবাই এই কৃষ্ণাঙ্গ কবির প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছে। কিন্তু এই স্বৈরাচারী সরকারের মন নরম হয়নি। মোলাইজ হলেন পঞ্চম ব্যক্তি, যিনি স্বঘোষিত আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। শ্বেতাঙ্গরা সরকারে থেকে অর্থনীতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করেছিলেন। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধেই চলছিল এই জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর লড়াই।

একটি হত্যা লড়াই স্তব্ধ করে দিতে পারে না। বরং নতুনভাবে সেই সংগ্রামে প্রাণসঞ্চার করে। প্রেরণা জাগায় অন্যান্য বিপ্লবীদের। যে নৃশংস অত্যাচারের পরিকল্পনা এই বর্ণবৈষম্যবাদী সরকার নিয়েছেন, তা নিন্দার কোন ভাষা নেই। এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রবল জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন। জনগণকে সচেতন করে তুলতে অবিলম্বে দেশ-বিদেশের কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসুন।

অভিজিৎ সেনগুপ্ত
কলকাতা ৮৪

ক্ষুধার্তের সংখ্যাবৃদ্ধি বনাম অপচয়ের ঢল

আরব দেশের বড় শহরে দেখেছিলাম মানুষ গোটা মুরগীর সামান্য খেয়ে বাকিটা ফেলে দিচ্ছে। গাদা গাদা সুস্বাদু মাংস ময়লার ঝুড়িতে যাচ্ছে। ভিক্ষুক নেই কুড়িয়ে খাবার। কয়েক বছর আগে দিল্লির বড় হোটেলে সমীক্ষা করে একটি সংস্থা ঘোষণা করেছিলেন কত শত টন খাদ্য অর্ধভুক্ত থাকে এবং ফেলে দিতে হয়। এগুলো সার হিসাবে অথবা পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের কথাও উঠেছিল।

বিশ্বের ৫০০ মিলিয়ন মানুষ প্রতি রাত্রে অনাহারে শয্যাগ্রহণ করে নানা দেশে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশের খাদ্য সঙ্কটের চরম কাহিনীর কথা না টেনে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কালাহান্দির মত এলাকার ঘাস-লতা-পাতা-গাছের মূল খাওয়া মৃত্যুমুখী মানুষের কথা আলোচনা করাই ভাল। কলকাতা শহরে বড় ও মাঝারি হোটেলে কত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়? গ্রাম-গঞ্জের কিছু বড়লোকের বাড়ির ভোজে, (অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনকে উপেক্ষা করে) শহরের বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে কীভাবে খাদ্য নষ্ট হয়!!

বুদ্ধিজীবী ও সমাজ-সচেতন মানুষ এই অপচয়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন। অপচয় করা যেন পৌরুষ ও সামাজিক কৌলিন্য প্রদর্শনের হাতিয়ার হয়ে না দাঁড়ায়।

এ এফ কামরুদ্দীন আহমেদ
বাদপুর, হুগলী

পরিবর্তন চাই

পরিবর্তন আমাদের দেশে নিয়মিত আসে না। তাই কেউ যদি কষ্ট করে আমাকে মাঝে মাঝে পরিবর্তন পাঠান, বিনিময়ে আমি তাঁকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী বাংলাদেশে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা অবশ্যই পাঠাব।

মোঃ আমু
বায়তুল আমান
বি বাড়ীয়া, বাংলাদেশ

বিনিময়ে ইচ্ছুক

বিদেশের কোন পাঠক-পাঠিকা বন্ধুর সঙ্গে পত্র-পত্রিকা আদান-প্রদান করতে চাই। কোন পাঠক-পাঠিকা বন্ধু যদি তাঁর দেশের বাংলা পত্র-পত্রিকা পাঠান, তাহলে আমি তাঁর পছন্দমত 'পরিবর্তন' সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকা পাঠাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিবকুমার সরকার
২১ নৃপেন সরকার রোড
কাঁচরাপাড়া, চব্বিশ পরগণা

আপনার অঞ্চল, আপনার সমস্যা

সাবধান, ব্যাগ-ধরা চোর!

বনগাঁ লাইনের ট্রেনে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন দুর্গানগর আর বিরাটি স্টেশনের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনে আলো জ্বলে না। কিন্তু হয়তো অনেকেই জানেন না এটুকু সময় অনেক মূল্যবান দ্রব্য হারাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত এক শ্রেণীর মহিলারা এই সময়ে চুরির কাজে সামিল হন।

ব্যাপারটা খুলে বলি। ধরুন আপনি জায়গা না পেয়ে ট্রেনের ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন। আর হাতের ব্যাগটি বসে থাকা কোন মহিলার হাতে দিয়েছেন। বিরাটি আসার আগে ঐ অল্প সময় অন্ধকার হলেই মহিলাটি আপনার ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে টাকা পয়সা, রুমাল, পেন বা সামান্য যা কিছু পাবে তা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে রাখবে। আপনি সরল মনে ব্যাগটা নিয়ে ঘরে ফিরবেন। পরে ব্যাগ খুলে চমকে যাবেন, তখন আর কিছু করার থাকবে না। তাই প্রতিটি যাত্রীকে সাবধান করে দিচ্ছি! আপনারা কেউ সন্ধ্যের পর থেকে কোন সময় কারুর কাছে ব্যাগ রাখবেন না।

পথিক মণ্ডল
নিউ ব্যারাকপুর, চব্বিশ পরগণা

একটি রাস্তা

শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার সর্ববৃহৎ চিকিৎসা-কেন্দ্র। চিকিৎসা-কেন্দ্রটি গরীব জনসাধারণের একমাত্র ভরসাস্থল।

পূর্ব শিলচরের জনগণ রোগী নিয়ে অল্প খরচে এবং অল্প সময়ে সৈদপুর মেডিকেল কলেজ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন। দুঃখের বিষয় সরকার এই রাস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে উক্ত রাস্তার উন্নয়নের জন্য কিছু করেননি। রাস্তাটি অর্ধসমাপ্ত থাকায় কোন যানবাহন চলাচল করে না, বর্ষার সময় পাথর না থাকায় কাদায় রোগীকে হয়ত কাঁধে কিংবা ঠেলাগাড়িতে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হয়। অথচ এই রাস্তা পূর্ব শিলচর ও শিলচর মেডিকেল কলেজের প্রধান সংযোগ সড়ক। সরকার কি রাস্তার উন্নতির জন্য কিছু করবেন?

ফয়জুর রহমান
সৈদপুর, কাছাড়



ব্যঙ্গচিত্র ঃ লাহিড়ী

অম্লমধুর

—আমার স্বামী আমার থেকে ওর মাকে বেশি ভালবাসে।

—কিসে বুঝলে?

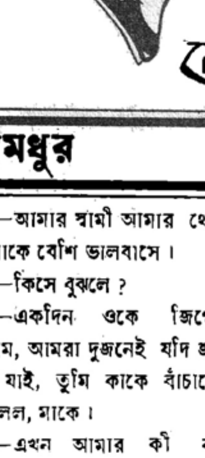
—একদিন ওকে জিগ্যেস করলাম, আমরা দুজনেই যদি জলে ডুবে যাই, তুমি কাকে বাঁচাবে? সে বলল, মাকে।

—এখন আমার কী করা উচিত?

—খুব তাড়াতাড়ি সাঁতার শিখে নেওয়া।

★

বিনয়—তাহলে তুমি বলতে চাও, তোমার বউ-এর সঙ্গে কোনদিনই তোমার মতের মিল হয়নি?



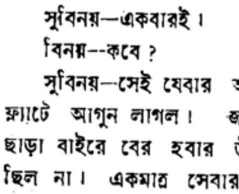
সুবিনয়—একবারই।

বিনয়—কবে?

সুবিনয়—সেই যেবার আমার ফ্ল্যাটে আগুন লাগল। জানলা ছাড়া বাইরে বের হবার উপায় ছিল না। একমাত্র সেবারই ও আমার মতে মত দিয়েছিল।

★

অভিনেত্রী—ওঃ! এক ঘণ্টা ধরে চেঁচাচ্ছি! খিদে পেয়ে গেছে। খালি পেটে কি অভিনয় হয়?



পরিচালক (বিরক্ত)—মাপ করবেন ম্যাডাম। আমি আপনার মুখের ছবি তুলছি, খালি পেটের নয়।

★

শিক্ষক—কোশ্চেন পেপার ছাপতে প্রেসে চলে গেছে।



পরীক্ষার আর মাত্র দুদিন দেরি। তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

একজন ছাত্র—প্রেসের নাম-ঠিকানাটা বলবেন স্যার?

★

বক্তা—আমি চাই ল্যাণ্ড রিফর্ম, চাই হাউসিং রিফর্ম, চাই এডুকেশনাল রিফর্ম, আমি চাই—

বিরক্ত শ্রোতা ঃ ক্লোরোফর্ম!

★

চাকরিদাতা ঃ আপনি কী কী কাজ করতে পারেন?

চাকরিপ্রার্থী ঃ কিছুই পারি না স্যার।

চাকরিদাতা ঃ তবে তো আপনাকে চাকরি দিতে পারছি না। আমার অফিসে উঁচু পোস্টের চাকরি একটাও খালি নেই।



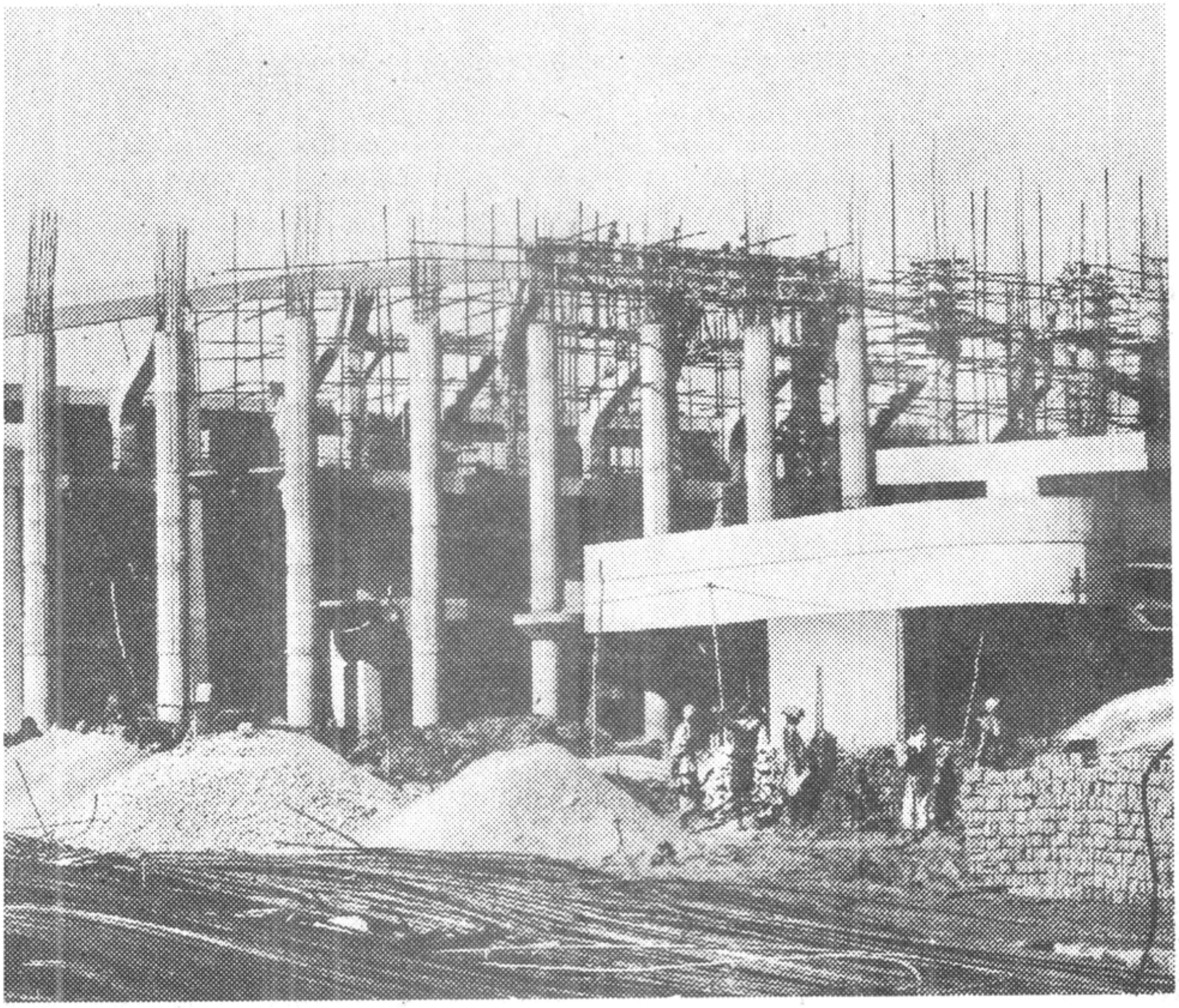
জজসাহেব—স্বামীকে গুলি করে মারলে আর বলছ নেহাৎ দুর্ঘটনা?

আসামী—হ্যাঁ ধর্মাবতার। আমি তাকে মারতে চাইনি।

জজসাহেব—ওরকম সবাই বলে।

আসামী—না, আসলে আমি তাক করেছিলাম আমার শাশুড়ির দিকে। স্বামী হঠাৎ মাঝখানে এসে গেলেন।

সংকলক ঃ বিক্রম মজুমদার



পাঁচ মিনিট

ঘুঘু ইত্যাদি গল্প

তিনটি যুবকযুবতী।

একটি ঘুঘু।

একটি জলপাই গাছের শাখা।

এই তিনটি জিনিসে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না? নিশ্চয়ই মিল আছে, তবে সেটা গবেষণার বিষয়। আসলে এ তিনটি প্রতীক চিহ্ন। যুববর্ষে ট্যাঁকশাল থেকে যে নতুন এক টাকার কয়েন বেরুচ্ছে, তাতে এই প্রতীক চিহ্ন থাকছে।

কিন্তু পাঠক হিসেবে যদি আপনি প্রশ্ন করেন—মশাই প্রতীকের তো একটা মানে থাকবে—যেমন, তেরঙা ঝাণ্ডার তিন রঙের মানে আছে। কাস্তে হাতুড়ি তারার তিনটি জিনিসের মানে আছে। কিন্তু এর মানে তো আমাদের মুণ্ডুতে ঢুকছে না।

এই সব প্রতীক মাথা খেলিয়ে কারা বার করে বলুন তো? জানি বলবেন—কেন, বড় বড় সরকারি অফিসাররা। আর নকশা করে শিল্পীরা।

ঠিকই বলেছেন। তবু সবটা বলতে পারেননি। এর পেছনে অফিসারের গিন্নিরাও থাকেন, যাঁরা স্বামীকে এই কঠিন কাজে সাহায্য করেন। : ওগো, তুমি এত চিন্তা কোর না, আমি তো আছি। আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে ট্যাঁকশাল থেকে যে ট্যাকা বেরুবে তার ওপরে কী ছবি থাকবে।

অফিসার হেসে গিন্নিকে বললেন ডার্লিং, এসব কঠিন ব্যাপার, এখানে তোমার কী রোল আছে? তুমি আমায় কী জ্ঞান দিতে পার?

: দেখ, এটা হচ্ছে যুববর্ষ। যুববর্ষ মানেই যুবক-যুবতী। যুবক-যুবতী মানেই ইয়ে···। একটা যুবতী পেছু দুটি যুবক। বেশ লড়াকু ইমেজ।

: তাহলে বলছ কয়েনের ওপর তিনটি যুবক-যুবতীর চেহারা থাকবে; কিন্তু বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাবে না?

: আরে আমার কথা কি শেষ হয়েছে? পরেরটুকু শোন—আজকালকার ছেলেমেয়েরা আগেকার ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি চালাক। আইবুড়ো বেলায় তোমার চিঠির উত্তর লিখতে আমার বুকে যেন হাতুড়ি পিটত। আর এখনকার ছেলেরা প্রেমিকার বাবার হাত দিয়ে চিঠি পাঠায় প্রেমিকাকে।

: অ্যাঁ, বল কী ডার্লিং।

: হ্যাঁগো হ্যাঁ।

: কিন্তু বাবা মেয়েকে সে চিঠি পৌঁছে দেয়?

: হ্যাঁ, তা না হলে মেয়ের বাবা মেয়ের আগেই ইলোপ হবে। যাক, যা বলছিলাম, এই চিঠির ব্যাপারটা প্রতীকের মধ্যে থাকবে। ধর চিঠির প্রতীক হচ্ছে পায়রা। আগের যুগে পায়রারা চিঠি বইত। কিন্তু পায়রা আবার শান্তির প্রতীক। অতএব পায়রা বাদ পায়রার মত দেখতে একই ফ্যামিলির পাখি ঘুঘু।

আজকের যুবক- যুবতীরা অনেক বেশি ঘুঘু। তাই প্রতীকে একটা ঘুঘু থাক।

: তা থাক! কিন্তু তবু যেন কীসের একটা অভাব থাকছে!

: একটা অভাব থাকছে বটে। আর তা হচ্ছে যুব সমাজের উন্নতির রাস্তার কথা প্রতীকে বলা হল না।

: তাতো বুঝলাম, কিন্তু সেটা কী? একটা সূর্যের ছবি দেব?

: তুমি একটি আকাট। যত প্রিমিটিভ চিন্তাধারা! ও চিহ্ন দাদের মলমে চলে। আধুনিক প্রতীক দরকার। আর তা হল তেল।

: তেল?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, তৈল মর্দন না করতে পারলে আজকের- যুবকদের কোন উন্নতি নেই। কিন্তু সরষের তেল এখন কেউ মাখতে চায় না। যারা তেল মাখতে চায় তারা চায় তেলটা একটু দামী হোক। মানে অলিভ অয়েল হলে বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু জলপাইয়ের ছবি দিলে লোকে নারকুলে কুল ভাবতে পারে: তার চেয়ে বরং একটা জলপাই গাছের ডাল থাক।

: সত্যি গো, তোমার বুদ্ধির কাছে আমি ভেড়া।

: চুপ, কেউ শুনলে সত্যি ভাববে। □

সৌরেন মিত্র

জ্য-রাজনীতির নেপথ্যে

পি আই (এম)ও বামফ্রন্টের বহু দলত্যাগীকে দলে নিয়ে থাকে, তা হলে সি পি আই কী দোষ করল ?

নিশীথ দে

ইটার্স বিলডিংসে বামফ্রন্টের
রিক দলের মন্ত্রী খুব খাতির
ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।
রটা বুঝলাম না। বাইরে
বাতি জ্বালিয়ে তাঁর অফিসের
ক ডেকে বললেন, দু কাপ চা
য় দাও। আর এখন ঘরে
ক পাঠিও না।

নগারেটে টান দিয়ে বললেন,
ড় পার্টিকে নিয়ে লিখলেই
ওদের কথা তো অমৃত-
। লিখে শেষ করতে পারবে ?
জর ঝাড়। বুঝলে, শুধু
। এখন আর কান টানলে
আসে না। মাথাগুলো খুব
। থাকগে, ওসব বড় ঘরের
ছোট ঘরের লোকদের
না। এবার আমাদের মত
পার্টিদের নিয়ে একটু-আধটু
তোমার কলমের জোরটা
। বললাম, হাতে প্রমাণ না
লিখি না। আপনার সঙ্গে
ব্যক্তিগত সম্পর্ক বরাবরই
তথ্য প্রমাণ পেলে লিখব।
আপনি আমার ওপর
ষ্ট হলে…। না, না, আমি
ষ্ট হব কেন? বরং বলতে
খুশি হব।

াপনার পার্টির হাতে একটা
া আছে। আপনারই
া এক নেতা তার চেয়ার-
সেই পুরসভার বিরুদ্ধে
র অনেক অভিযোগ। রাজ্য
র বোধহয় পুরসভার বোর্ড
করে দেবে।

ল, বাতিল করবে না। সি
াই (এম) বাতিল করতে
না। অবাক হয়ে যাচ্ছি!
, সি পি আই (এম) এখনও
তে ভাগ বসায়নি। আমি
কে সব তথ্য দেব।

াপারটা খুব গোলমেলে মনে
বললাম, এতে লেখালেখির
রকার? আপনি পার্টির
। দুর্নীতির অভিযোগে পার্টি
বহিষ্কার করে দিন না।

াবার সিগারেটে কষে টান
দিলেন। তুমি মার্ক্সবাদী রাজনীতিটা তাহলে কিছুই বোঝনি। বড় পার্টি, মানে সি পি আই (এম), তো সেইটাই চায়। ওত পেতে বসে আছে। আমি চেয়ারম্যানকে পার্টি থেকে তাড়াব আর সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই (এম) দলে নিয়ে নেবে। বড় পার্টি, বুঝলে, গলার জোরে প্রমাণ করে দেবে ওই চেয়ারম্যান যুধিষ্ঠিরের ডুপলিকেট। আর মন্ত্রী, মানে আমি, ওকে চুরি করতে বলেছিলাম। রাজি হতে পারেনি বলে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিলে। ওরা দিনকে রাত করতে পারে।

ওই মন্ত্রীমশাই-এর আশঙ্কা কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে তা তাঁরাই জানেন। তাব সি পি আই (এম) এ পর্যন্ত যাঁদের পার্টি থেকে বের করে দিয়েছেন বা যাঁরা পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ছাড়া বলা হয়নি যে, রাজনৈতিক মতভেদের দরুন বের করে দেওয়া হয়েছে বা তাঁরা বেরিয়ে গিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, দুর্নীতিগ্রস্ত বা মহিলা-ঘটিত ব্যাপার অথবা পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। আজ পর্যন্ত একজনের বিরুদ্ধেও প্রমাণ দিতে পারেননি। লোকসভা নির্বাচনের পর প্রকাশ্যে পার্টির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন হুগলি জেলার প্রবীণ সদস্য মনোরঞ্জন হাজরা। তিনি শুধু দুঃখ প্রকাশ করায় সাত খুন মাপ হয়ে গেল। মনোরঞ্জনবাবু যে কথা বলেছেন তা অন্য কেউ বললে সি পি আই (এম) নেতারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন—পুঁজিপতিদের দালাল, কুৎসা রটনাকারী, স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা কংগ্রেস-এর দালাল ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেন।

বামফ্রন্টেরই শরিকদলের অনেক বহিষ্কৃত নেতা এবং কর্মীকে সি পি আই (এম) শুধু যে দলে সদস্যপদ দিয়েছে তাই নয়, নেতার পদে বসিয়ে দিয়েছে। তাঁরা সব ধোয়া তুলসী পাতা ?

নানুরের বিধায়ক বনমালী দাসকে নিয়ে সি পি আই (এম) নেতা সরোজ মুখার্জি যা করলেন তা নজির হয়ে রইল। সরোজবাবু বলেছেন, 'আমরা ক্ষমতাসীন দল। আমরা বলছি বনমালী দাস দুর্নীতিগ্রস্ত। তারপর আবার প্রশ্ন ওঠে কী করে!' সরোজবাবু আর একটা কথা বলেছেন, 'আমাদের পার্টি থেকে যাঁরা চলে গিয়েছেন বা আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি তাঁরা শেষ হয়ে গিয়েছেন।'

ক্ষমতাসীন দল যা বলবে সেটাই সত্যি ? তা যদি হয় তাহলে সব দলই তো বলতে পারে তারা যেটা বলবে, সেটাই সত্যি। অন্তত বামফ্রন্টের দলগুলো নিশ্চয়ই পারে। সি পি আই-ও তো ক্ষমতাসীন দল—তারা তো বলছে, বনমালী দাস দুর্নীতিগ্রস্ত নন!

আর রাজনীতিতে কে যে কীভাবে ওঠে আর কীভাবে শেষ হয়ে যায় কেউ জানে না। সরোজবাবুরা তো ভাল করেই জানেন : যাঁরা রক্ত দিয়ে পার্টিকে গড়ে তুলেছেন, যাঁরা ব্যক্তি জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পার্টির কাছে সঁপে দিয়েছেন, যাঁদের পার্টির সদস্যপদ ছাড়া হারাবার কিছুই নেই তাঁরা তো সি পি আই (এম)-এর বর্তমান রাজনীতিতে ফসিল ছাড়া আর কিছুই নয়। কাদের কাছে শেষ হয়ে যাচ্ছে ? হ্যাঁ, সি পি আই (এম)-এর কাছে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস এঁদের ঠিকই আশ্রয় দেবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এঁরা বেঁচে থাকবেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এম এন রায় সম্পর্কে মুজফফর আহমদ তাঁর লেখায় রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলতে পারেননি, শুধু ব্যক্তিগত কুৎসা করেছেন। টাকা চুরির অপবাদ দিতেও ছাড়েননি। এম এন রায় বর্তমান রাজনীতিতে অচল। কিন্তু সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মানুষ, যাঁরা রাজনীতিতে আদর্শবান, সৎ, নিষ্ঠাবান তাঁরা মুজফফর আহমেদের মতামতকে কতটা মূল্য দেন!

সি পি আই (এম) শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। কিন্তু নেতৃত্ব কাদের হাতে ? প্রতিটি জেলায় সৌখিন রাজনীতি করা লোক মাথা চাড়া দিয়েছে। অধ্যাপক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষক, জোত-জমির মালিক নেতৃত্বে বসে আছেন। যাঁরা নেতৃত্বের নামে নিছক কর্তৃত্ব করছেন।

রাজ্য কমিটির নেতারা চলেন পেটি বুর্জোয়া নেতাদের রিপোর্টে। আর মন্ত্রীরা চলেন জেলাশাসক এবং এস পি-দের রিপোর্টে। নেতারা একবার আচমকা চলে যান নানুর, কীর্নাহার, লাভপুর, পলশা, দাসকল, ছাতিমগ্রাম, জুবুটিয়ায়। সরজমিনে তদন্ত করে দেখবেন পার্টিকে আপনার জেলার নেতারা কোথায় নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের মানুষ বুক দিয়ে যে সি পি আই (এম)-কে ভালবাসত আজকে সেই পার্টির কী হাল।

বনমালী দাসকে নিয়ে এত হৈচৈ করার কী আছে ? সি পি আই (এম)-এর দলত্যাগী বা বহিষ্কৃত কর্মী বা নেতা নয়, এম এল এ-কেও তো অন্য দলে নেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের এম এল এ মনোরঞ্জন রায় আর এস পি-তে সদস্যপদ পেয়েছেন। কোন হৈচৈ হয়নি।

যেকোন পার্টির সদস্য যেকোন দলে যেতে পারেন। সি পি আই বা ফ্রন্টের অন্য শরিক দল সি পি (এম)-এর কাছে মুচলেকা দিয়ে রেখেছে ? নাকি সি পি আই (এম)-এর দাসত্ব করতে এসেছে ? ভারতীয় সংবিধানে যেকোন ভারতীয় নাগরিককে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই মৌলিক অধিকার কেড়ে নেবার অধিকারও কি ক্ষমতাসীন বলে সি পি আই (এম) পেয়ে গিয়েছে ? □


এক
সুপার ফাইটার
কি ক'রে দাঁতের গর্তের সঙ্গে
যুদ্ধ করল।
একদিন আমার ছেলে হাঁপাতে হাঁফাতে এসে বলল...
"মা, মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে"
"মানে, দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা"
দাঁতে গর্ত ?
তাকে বোঝালাম, কি ক'রে দাঁতকে একনাগাড়ে কত হামলা সইতে হয়...
"দাঁতে গর্ত হওয়ার কারণ হল, দাঁতের ফাঁকের খাবারের কণায় জীবাণু জন্মে একরকম অ্যাসিড তৈরী করে, যা দাঁতের এনামেলের ওপর হামলা করে"
...আর, ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড কি ভাবে কাজ ক'রে ওর দাঁত সুরক্ষিত রাখে...
Forhan's for the GUMS
with active FLUORIDE to check tooth decay
"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইডের ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে সত্যি-সত্যিই দাঁত শক্ত করে..."
..."ফলে, জীবাণু দাঁত ভেদ ক'রে গর্ত করতে পারে না"
"হুঁ হুঁ, আমার স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা
সুপার ফাইটার
আর, তার ওপর, ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড দেয় ফরহ্যান্স-এর সেই সুবিখ্যাত যত্ন!
FOR THE GUMS
Forhan's
with active FLUORIDE to check tooth decay
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড মাড়ি সঙ্কুচিত করে, ক্ষয়ের মোকাবিলা করে।
404-GM-244 BEN

আমি চাই কংগ্রেসকে জনগণের আন্দোলনে সামিল করতে— প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস (ই)-এর সদ্য নিযুক্ত সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী পরিবর্তনকে এই সাক্ষাৎকারটি দেন ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫। প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে প্রিয়রঞ্জনের এই সাক্ষাৎকারটি টেপ রেকর্ড-এ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবর্তন : কংগ্রেস (ই)-র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়াটা জানতে পারি?

প্রিয়রঞ্জন : একটা প্রচণ্ড দায়িত্ব কোন মানুষের কাঁধের ওপর এসে পড়লে যেমন মানসিকতা হয় সেরকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সমুদ্রে দারুণ ঝড়—নৌকোতে আমি চেপেছি এবং আমাকে পাড়ে পৌঁছতে হবে। আমার দায়িত্ব নৌকো যেন ডুবে না যায়—যাত্রীরা যেন প্রাণে বাঁচে—এই পর্যন্ত।

পরিবর্তন : আপনার সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিরোধ স্পষ্ট। আপনার পূর্বসূরীদেরও এই সমস্যার ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সমস্যার সমাধান আপনি করবেন কী করে?

প্রিয়রঞ্জন : এ বিষয়ে আমার চিন্তাটা খুব পরিষ্কার। কংগ্রেসের মধ্যে সর্বস্তরের ঐক্য সাধন করে সমস্ত মতপার্থক্য মিটিয়ে, কংগ্রেসের কাজ কোন সময়ই করা যায়নি। এমনকী জাতীয় আন্দোলনের সময়ও করা যায়নি। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, গান্ধীজীর মত অত বড় একজন জাতীয় নেতার সঙ্গে কয়েকজন নেতার মতপার্থক্য সত্ত্বেও মূলত কংগ্রেস আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বেই চলেছিল। তার কারণ এই যে, জনগণকে সে আন্দোলনে সামিল করা হয়েছিল। জনগণকে আন্দোলনে সামিল করে রাখলে অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল বা ছোটখাটো ব্যাপারগুলি বিশেষ বিষয় হয়ে ওঠে না। তাই জনসাধারণের ভেতর যদি কংগ্রেসকে সামিল করা যায় তবে কোন ছোটখাটো মতপার্থক্য গুরুত্ব পাবে না। এটা আমরা অতীতেও দেখেছি, সেই শিক্ষা নিয়েই বলছি—সাধারণ মানুষের পাশে যদি কংগ্রেসকে দাঁড় করাবার কাজে আমি আত্মনিয়োগ করতে পারি তবে এ ধরনের ছোটখাটো ব্যাপার গুরুত্ব পাবে না। আর যদি সংগঠনকে অলস রেখে আমি



প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী : চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ফটো : শংকর নাগ দাস

কে ক্ষমতায় থাকবে আর কে থাকবে না তাই নিয়ে চর্চা করি, জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন বা লড়াই না করি তাহলে আমিও চালাতে পারব না—তা যত বড়ই সমর্থন আমার পিছনে থাক।

আর অতীতের যে কথা আপনি বলছেন, তাতে আমি কারো ওপর দোষারোপ করতে চাই না। অতীতে যাঁরা এই আসনে ছিলেন তাঁরা আমার চেয়ে অভিজ্ঞ, প্রবীণ। শুধু তাই নয়—তাঁদের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি এবং তাঁদের নেতৃত্বে আমিও কাজ করেছি। তাই অতীতের যা ভাল তাই আমি গ্রহণ করব আর অতীতের যা মন্দ তা আমি পরিত্যাগ করে চলব।

পরিবর্তন : আপনি বললেন আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠন তৈরি করবেন। এ ব্যাপারটা কী?

প্রিয়রঞ্জন : আমি জানি কংগ্রেসের শতকরা ৯৯ ভাগ লোক কংগ্রেসের কাজে সামিল হতে চান। আর সামান্য-সংখ্যক লোক কাজ না করে গোলমাল করতে চান। এই ৯৯ ভাগ লোককে আমি যদি সন্তুষ্ট রাখতে পারি তা হলেই কংগ্রেসের কাজ হল।

পরিবর্তন : এই আন্দোলন সম্পর্কে আপনার কি নির্দিষ্ট ভাবনা আছে?

প্রিয়রঞ্জন : এই আন্দোলন মূলত গ্রাম-বাংলার মানুষের ওপর যে অত্যাচার চলছে তার প্রতিবাদেই গড়ে তুলব। বর্তমানে গ্রামের মানুষ অসহায়। জঙ্গলের রাজত্বেও একটা রাজা থাকে, একটা সিংহ থাকে—সে কিছু নিয়মকানুন করে রাখে—যেমন শিয়াল এটা করবে, হাতি এটা করবে—এ ওটা করবে না, কিন্তু এ রাজ্যে তা-ও নেই। দিনের পর দিন গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। তাই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই—পথ নেই।

পরিবর্তন : এই আন্দোলনের কোন কার্যসূচি তৈরি করা হয়েছে?

প্রিয়রঞ্জন : না, এখন করিনি। আমি রাজ্য কমিটি তৈরি করার পর ও'দের সঙ্গে আলোচনা করে আন্দোলনের পরিকল্পনা ঠিক করব। তবে গুরুত্ব পাবে গ্রাম বাংলা। এ রাজ্যে গ্রামে মানুষের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চলছে।

পরিবর্তন : সম্প্রতি সংবাদে

প্রকাশ যে, আপনি মনে করেন আপনার দলে বেশ কিছু সমাজ-বিরোধী ঢুকে গিয়েছে ?

প্রিয়রঞ্জন : না, আমি সে কথা বলিনি। আমি বলেছি, সি পি আই (এম) দল সবসময় অভিযোগ করে কংগ্রেসী সমাজ-বিরোধীদের কংগ্রেস শায়েস্তা করুক। আমি তাদেরকে বলেছি যে, কংগ্রেসে সমাজবিরোধী নেই। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যেগুলো হয় আমি সেগুলো লক্ষ্য করে দেখেছি যে সি পি আই (এম)-এর 'প্লান্ট' এবং 'ইনফিলট্রেশনে'র জন্য, যেমন চালের মধ্যে যদি কেউ লুকিয়ে কাঁকর মিশিয়ে দিয়ে যায়। এগুলোকে আমাদের সাংগঠনিক পর্যায়ে মোকাবিলা করার দরকার। তাই আমি বলেছি কংগ্রেস সমাজ-বিরোধীদের পার্টিতে এনে দল বড় করতে চায় না—এবং এ ধরনের কোন কাজ আমি বরদাস্ত করব না।

পরিবর্তন : কোন একজন কংগ্রেস (ই) নেতা হিসাবে নয়—গণনেতা হিসাবে আপনি সমাজ-বিরোধী বলতে কাদের চিহ্নিত করেন ?

প্রিয়রঞ্জন : সমাজবিরোধী বলতে যে ধারণা, সেই ধারণাটার সঙ্গে অর্থনীতি, সমাজনীতি আর রাজনীতি জড়িত। এটাকে আমি কোন একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের 'ক্যানভাসে' রাখতে চাই না। প্রশ্নটা হল, সমাজবিরোধী কার্যকলাপে যদি প্রশাসন উৎসাহ দেয় সেটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। যেমন বলি, খুব একটা সাধারণ উদাহরণ—কোন একটা যুবক যদি এই প্রেরণা পায় যে, কাউকে খুন করার পর—তারা ক্ষমতায় এলে সেই খুনের মামলা তুলে নেওয়া যায়—তাহলে খুনের প্রবণতাটা স্বভাবতই থেকে যায়। যেমন, দেখুন সাঁইবাড়ির কেস। আর একটা উদাহরণ দিই, যেমন কোন মা-বোন যদি এই নজির দেখতে পান কোন হেডমাস্টারকে হত্যা করার পর খুনীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তাহলে কী দাঁড়াবে ? এই ঘটনা-গুলোই আজকের সমাজে সমাজ-বিরোধীদের প্রশ্রয় যোগাচ্ছে।

পরিবর্তন : কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিল আপনি গণনেতা হিসাবে সমাজবিরোধী বলতে কাদের চিহ্নিত করলেন ? যারা খুন করেছে তারাই কেবল সমাজ-



বিরোধী ?

প্রিয়রঞ্জন : না না, তা নয়। দেখুন এটার ডেফিনেশন খুব ওয়াইড। স্মাগলিং, ব্ল্যাক মার্কেটিং, লুটিং, রবিং, অ্যাসাসিনেটিং করে যারা রোজগার করে—যাদের প্রফেশন, তারাই সমাজবিরোধী।

পরিবর্তন : সম্প্রতি পশ্চিম-বঙ্গে শিল্পায়ন ও তার সমস্যা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যৌথভাবে যে আন্দোলন করেছে আপনি তার বিরোধিতা করলেন কেন ?

প্রিয়রঞ্জন : না, না, আমি নয়। আমার দল কংগ্রেস ও আমাদের লেজিসলেটিভ পার্টি বিরোধিতা করেছে। আমার নিজস্ব কোন মন্তব্য নয়, আমার দলের বক্তব্য। আমাদের বক্তব্য হল—পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে সর্বনাশ, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে সর্বনাশ, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সর্বনাশের জন্য মূলত বামফ্রন্ট সরকারই দায়ী।

পরিবর্তন : আপনি কি আই এন টি ইউ সি-র স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন ?

প্রিয়রঞ্জন : ওয়েল, আমি যতদূর জানি, আই এন টি ইউ সি সাংগঠনিকভাবে একটা স্বয়ংশাসিত সংগঠন হতে পারে তবে তাদের দায়বদ্ধতা কংগ্রেসের দর্শন ও দলের কাছে।

পরিবর্তন : আপনি চাইছেন প্রবীণদের নিয়ে এসে সংগঠন জোরদার করতে, ওদিকে আপনার সর্বভারতীয় সভাপতি নবীনদেরই প্রাধান্য বেশি দিয়েছেন—আপনার এই সিদ্ধান্ত কি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিকার কথা বিবেচনা করেই ?

প্রিয়রঞ্জন : না, তা নয়। আমি বলেছি প্রবীণ কংগ্রেসীদের আশীর্বাদ আর নবীন কংগ্রেসীদের সহযোগিতা নিয়েই সংগঠন গড়ে তুলব। আমি প্রবীণদের দলের দায়িত্বে নিয়ে আসব একথা কখনো বলিনি।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গের নেতা হিসাবে কি আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতিকে সমর্থন করেন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ?

প্রিয়রঞ্জন : দেখুন, ভারতে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটা নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। তার একটা উদাহরণ ন্যাশনাল টেক্সটাইল পলিসি। আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি সম্পর্কে ধারণা আর একটু স্পষ্ট হয়েছে। আমাদের যেহেতু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে কোন মৌল পরিবর্তন হয়নি তাই এ বিষয়ে আমার কোন বিরোধী মনোভাব নেই—এখন আমরা সবাই চাইছি তিনটে জিনিসের ওপর নির্ভর করে ভারতকে শিল্পে স্ব-নির্ভর করতে। প্রথমটা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে। দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থানের জন্য যে শিল্প উদ্যোগগুলো আছে সেসব শিল্প উদ্যোগের 'কস্ট - স্ট্রাকচার' কম রাখতে, যার ফলে শিল্প উদ্যোগগুলো 'সিক' হয়ে না পড়ে। আর তৃতীয়ত, যে জিনিস-গুলোর উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও আমরা পরনির্ভরশীল সেগুলোকে আমাদের দেশেই তৈরি করতে—যেমন, কম্পিউটার। এই তিনটেই নতুন। তাই এখনি কিছু বলা উচিত হবে না, তবে আমি আশাবাদী।

পরিবর্তন : কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকাকে কীভাবে দেখবেন ?

প্রিয়রঞ্জন : দেখুন, এ ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের জন্য জ্যোতি বসুর সরকারকে বুঝতে হবে, শিল্প জিনিসটা কী এবং তা করতে গেলে কী করতে হবে। আমি মনে করি এই রাজ্য সর-কারের 'বেসিক ইকনমিক কন-সেপ্টটা'ই নেই। এই এখানে একজন বসে আছেন জয়নাল আবেদিন, এক সময় রাজ্যের রুগ্ন শিল্প ও সরকারি উদ্যোগের মন্ত্রীও ছিলেন। সেদিন এর থেকেও খারাপ অবস্থায় ডি পি এল, স্যাকসবি ফারমা প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রফিট দেখিয়েছেন। তার থেকে বেশি মার্কসিস্ট কমিটমেন্টের লোকেরা এসে কী সর্বনাশের পথে ঐ সংস্থাগুলোকে নিয়ে গিয়েছে তা তো আপনারাই দেখছেন। তাই আমি কখনোই মনে করি না এ রাজ্যের সরকারের শিল্প উদ্যোগ সম্পর্কে কোন ধারণা আছে। ☐

সাক্ষাৎকার :
শ্যামল বসু

ফটো : সৌগত রায় বর্মন



সুব্রতর কাজকর্ম কংগ্রেসের শৃঙ্খলার আওতায় পড়ে না —প্রণব মুখোপাধ্যায়


প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার ঠিক আগের দিন নিজাম প্যালেসে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়। প্রণববাবু সে সময় সংগঠনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একমাত্র কংগ্রেস-কর্মীরা ছাড়া তাঁর কাছে তখন আর কোন সঙ্গী ও প্রার্থীরা ছিলেন না। সাক্ষাৎকারের সময় সবাই ঘর থেকে চলে গেলেন। প্রিয় পাইপটি ধরিয়ে প্রণববাবু (মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নেবার পর তাঁর চেহারা এখন বেশ খারাপ হয়ে গেছে) তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ী ভঙ্গিতে বললেন, বলুন কী বলবেন।

পরিবর্তন : আপনি আগ বাড়িয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করতে গেলেন কেন ?

প্রণববাবু : আমি পুরসভায় কংগ্রেসকে জেতাবার নৈতিক দায়িত্ব নিয়েছিলাম। জেতাতে পারিনি, তাই পদত্যাগ করলাম।

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন দল হেরে গেলে সভাপতির পদত্যাগ করা উচিত ?

প্রণববাবু : নির্ভর করে ইস্যুটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর। কলকাতায় লোকসভা নির্বাচনে আমরা জিতেছিলাম। পুরসভা নির্বাচনে জেতার পরিবেশ ছিল। তা সত্ত্বেও যে হার হল, এর দায়িত্ব আমি এড়াতে পারি না।

পরিবর্তন : সুব্রতবাবু সিটুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে সব বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে একটা বিভ্রান্তি হচ্ছে। আপনার কী মত ?

প্রণববাবু : হ্যাঁ, বিভ্রান্তি হয়েছে।

পরিবর্তন : আপনারা কল-কারখানা বন্ধের বিরোধিতা করেছেন, আবার বনধের প্রতিরোধ করতে যাননি। সুব্রতবাবু তো প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিলেন বনধ বিরোধিতা করব না।

প্রণববাবু : শিল্পক্ষেত্রে আজ যা ঘটছে তার জন্য দায়ী বামফ্রন্ট সরকারের নীতি। ওঁরা বনধ করে সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রের ওপর চাপাতে চাইছেন। আমরা এজন্যই বিরোধিতা করেছি। বনধ ভাঙার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আজ যদি জোর করে বনধ ভাঙতে যেতাম, তাহলে রক্তপাত হত। তাই নীতিগতভাবে বিরোধিতা করেছি।

পরিবর্তন : আর সুব্রতর ব্যাপারটা ?

প্রণববাবু : সুব্রত বি পি এন টি ইউ সি-র সভাপতি হিসাবে বনধ সমর্থন করেছেন। তিনি যদি ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে থাকেন, তাহলে সেটা আই এন টি ইউ সি বুঝবে। বি পি সি সি-র এক্তিয়ারে এটা পড়ে না।

পরিবর্তন : কিন্তু আই এন টি ইউ সি তো কংগ্রেসী সংগঠন।

প্রণববাবু : কিন্তু সেটা শ্রমিক সংগঠন। সেদিক থেকে তাঁদের গঠনতন্ত্রও আলাদা। একজন কংগ্রেসী আই এন টি ইউ সি নেতা হতে পারেন এবং তিনি আলাদাভাবে আই এন টি ইউ সি-র কর্মসূচি অনুসারে কাজ করতে পারেন। অতীতেও এমন নজির আছে।

পরিবর্তন : কিন্তু কেন্দ্র যে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করছে একথাটা তো ঠিক।

প্রণববাবু : কে বললে ঠিক ? না জেনেশুনে বলা খুব সোজা। ১৯৮০-৮৪ সালে সারা দেশের পাবলিক সেক্টর শিল্পের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বেড়েছিল ১০৪ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে ১২১ শতাংশ। ১৯৭৭-৭৯ সালে পাবলিক সেক্টরে এই রাজ্যে লগ্নি হয় ৬৮৪ কোটি টাকা। কংগ্রেস এসে লগ্নি করেছে ২১৩৫ কোটি টাকা। আপনি বলছেন, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করছে ?

পরিবর্তন : কিন্তু পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গকে মঞ্জুর না করে মহারাষ্ট্রকে করা হল কেন ?

প্রণববাবু : কারণ মহারাষ্ট্রে এটা করা বেশি লাভজনক। কেন্দ্রকে তো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সব ঠিক করতে হয়।

পরিবর্তন : জ্যোতিবাবু গোয়েঙ্কাকে দিয়ে প্রজেক্ট তো চালু করে দিলেন। এটা কেন্দ্র কোন শিল্পপতিকে দিয়ে করতে পারত। ঝুলিয়ে রাখার দরকারটা কী ছিল ?

প্রণববাবু : আমরা তো বরাবর বলে আসছি হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালে কেন্দ্র অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ওটা জয়েন্ট সেক্টরে করুন। সেদিন ওঁরা ভেবেছিলেন এতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ক্ষতি হবে। কেন্দ্রের কী দোষ ? আমরা তো জয়েন্ট সেক্টরকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। ওঁরাই তো ইচ্ছে করে দেরি করলেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাত সবাই জয়েন্ট সেক্টরে শিল্প করেছে। ওঁরা করেননি। আর বেসরকারি উদ্যোগ হলেও টাকার বড় অংশটা তো আসবে অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান থেকে। তার মালিকও তো কেন্দ্র। তাহলে কেন্দ্রের সমর্থন বা সাহায্য ছাড়াই কি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল হতে পারে ?

পরিবর্তন : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট বিরাট মিছিল বার করেছিলেন। সল্ট লেক থেকে হলদিয়া পদযাত্রার কথা বলছি। আপনার মন্তব্য কী ?

প্রণববাবু : নির্বাচনের প্রস্তুতি। একটা গিমিক দিয়ে লোক-ভোলান ব্যাপার। □

সাক্ষাৎকার : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়



অঙ্গে অঙ্গে
লিরিল-এর
তরতাজা করা তরঙ্গ!
লিরিল—এবার এক সতেজতা মাখা, রেশ টেনে রাখা
অনন্য সুরভিতে—মধুর সুরভি, যেন চনমনে তরতাজা করা
মধুর তরঙ্গ—অঙ্গে অঙ্গে ছুঁইয়ে দেয় সেই অনন্য মধুর আবেশ,
যার নামটি হ'ল লিরিল-এর সতেজতা!
লিরিল—লেবুর মত চনমনে তরতাজা করা সাবান।
নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!
NEW
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
LINTAS LR 46 2719 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন



৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। ফটো : গৌতম রায় বর্মন

পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) কি ভাঙনের মুখে?

আর কিছুদিন পরেই সি পি আই (এম) দলের দ্বাদশ সম্মেলন বসতে চলেছে। সর্বভারতীয় স্তরে নানা আদর্শগত প্রশ্ন নিয়ে এই দলের মধ্যে ইতিমধ্যেই ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সে ঝড় আছড়ে পড়েছে সবচেয়ে আগে পশ্চিমবঙ্গেই। এ রাজ্যে বীরভূমের বিদায়ী বিধায়ক বনমালী দাসকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তো এখন প্রকাশ্যই। বনমালী দাস একটি নিদর্শন মাত্র। এমন দল ছাড়ার ঘটনা আরও ঘটছে, ঘটছে 'দুর্নীতির দায়ে' নানা ক্যাডারকে বসিয়ে দেবার ঘটনাও। সত্যিই কি দুর্নীতির দায়ে পড়ছেন কোন কোন সদস্য? তা হলে এতদিন দুর্নীতির কথা ওঠেনি কেন? এই সময়ানুগ পারস্পরিক দোষারোপ কি সি পি আই (এম)-এর কোন খাড়াখাড়ি অথবা অপ্রকাশ্য ভাঙন ডেকে আনছে? দ্বাদশ সম্মেলনের আগে বা অব্যবহিত পরে সেটা পরিষ্কার হবে কি? এসব প্রশ্ন নিয়েই পরিবর্তন-এর এই প্রতিবেদন।

আর কদিন পরে সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্মেলন। তারপরই দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস। বোধহয় এবারের মত পরিস্থিতি আর কোন রাজ্য সম্মেলনের আগে হয়নি।

প্রতিটি জেলায় পার্টিতে গোষ্ঠী লড়াই জমে উঠেছে। কোন কোন জেলায় তিন-চারটি করে গোষ্ঠী। লোকাল কমিটি এবং জোনাল কমিটিগুলোর সম্মেলনেই হাওয়া এলোমেলো হয়েছে। জেলা নেতৃত্বের দিকে পাল্লা ভারি হয়নি। জেলা কমিটিগুলোর সম্মেলনে জোড়াতালি দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। এবার রাজ্য কমিটিতে ঝড় নয়, ভাঙনের সম্ভাবনা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিরোধটা মূলত রাজনৈতিক আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা নিয়ে নয়, পার্টির মধ্যে দুর্নীতি-দলবাজি আর সঙ্কীর্ণতা নিয়ে। বনমালী দাস বলি হয়েছেন। কিন্তু সব জেলাতেই বনমালী দাস আছেন। তাঁরাও তৈরি হয়েছেন সম্মুখ সমরের জন্য। পার্টির রাজ্য সম্মেলনের আগে একপ্রস্থ দলত্যাগ, বহিষ্কার, সদস্য-পদের প্রতি অনীহা, হতাশা—সব কিছু ঘটে গিয়েছে। রাজ্য সম্মেলনে

কিংবা তারপর যা ঘটতে যাচ্ছে তা নিছক ভাঙন। গোষ্ঠী লড়াই-এর পরিণতি কী দাঁড়ায় সেটাই দেখার।

সি পি আই-সি পি আই (এম)-এর মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী জন্ম থেকেই চলে আসছে। ক্ষমতায় আসার পর অর্থাৎ ১৯৬৭ থেকে এ লড়াই জমে উঠেছে। অনেক বুদ্ধিজীবী, অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, প্রবীণ নেতা পার্টি ছেড়েছেন। অনেককে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মূলত দুটি—দুর্নীতি এবং পার্টি বিরোধী কার্যকলাপ।

সি পি আই (এম)-এর প্রবীণ নেতা স্বয়ং বি টি রণদিভে পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পালটা ট্রেড ইউনিয়ন—'রেড ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন করেছিলেন। পরে তা ভেঙে দিয়ে পুরনো পার্টিতে ফিরে আসেন। আজকে সি পি আই (এম) নেতা সরোজ মুখার্জি বলছেন, এক দল থেকে বহিষ্কৃত সদস্যকে অন্য দলে নেওয়া যাবে না। ১৯৭১ সালে সি পি আই সহ অন্য দলের এম এল এ ভাঙিয়ে সি পি আই (এম) নেতারা সরকার গঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সি পি আই (এম) নেতারা প্রায়ই বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের আমাদের পার্টিতে স্থান নেই। এর জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু তদন্ত করবে কে? তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙে যখন সি পি আই (এম)-এর জন্ম হয় তখন সি পি আই (এম) নেতারা বর্ষীয়ান নেতা এস এ ডাঙ্গের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আপসেও রাজি হয়েছিলেন। আপসের শর্ত ছিল, এস এ ডাঙ্গেকে চেয়ারম্যান পদে বহাল রাখতে সি পি আই (এম) রাজি ছিলেন, যদি ই এম এস নামবুদিরিপাদকে সাধারণ সম্পাদক পদে মেনে নিয়ে পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীকে বহাল রাখা হয়। সি পি আই নেতারা রাজি হননি। রাজি হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত।

নেতারা যতই চিৎকার করুন না কেন, এটা বাস্তব সত্য যে, আজকের রাজনীতি দুর্নীতিমুক্ত নয়। অধিকাংশে রাজনৈতিক দলই দুর্নীতিগ্রস্ত। ক্ষমতাসীন দলে দুর্নীতি বেশি, অন্য দলে কম। আর এই দুর্নীতি থেকেই পার্টির মধ্যে গোষ্ঠী রাজনীতি, সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। নেতৃত্ব দখল করার প্রবণতা মাথাচাড়া দেয়। সৎ, নিষ্ঠাবান নেতা এবং কর্মীদের ভেতর হতাশার সৃষ্টি হয়।

সি পি আই (এম)-এ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী আজকে নয়, গোড়া থেকেই আছে। আজকে প্রতিটি জেলায় একটা নয়, একাধিক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী চলছে। কোন জেলায় কম, কোন জেলায় বেশি। নদীয়া, ২৪ পরগণা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী আগের চেয়ে অনেক বেশি সোচ্চার।

নদীয়া জেলার রানাঘাট এবং নবদ্বীপ জেলা নেতৃত্বকে মানে না। আট বছর ধরে চেষ্টা করে রাজ্য কমিটির নেতারাও বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে ঠাণ্ডা করতে পারেননি।

রাণাঘাটের এম এল এ গৌর কুণ্ডুর সঙ্গে জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি অজিত সান্যালের সম্পর্ক সাপ আর নেউলের মত। দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ভয়ে সি পি আই (এম) চাকদা কেন্দ্রে ১৯৭৭ সালে কোন প্রার্থী দিতে পারেনি, ওই আসনটিতে মনোনয়ন দিতে হয়েছিল আর এস পি সমর্থক বিনয় বিশ্বাসকে।

মুর্শিদাবাদে মধু বাগ, মন্ত্রী আবদুল বারি, তিমির ঘোষ, অরুণ ভট্টাচার্য বলতে গেলে সব নেতারই একটা করে গ্রুপ। মালদহে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য জেলা কমিটি ভেঙে দিতে হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রবীণ নেতা মাণিক ঝাকে জেলা পরিষদ নির্বাচনে হারানর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জীবন মৈত্র। গোটা উত্তরবঙ্গেই পার্টিতে গোষ্ঠী-লড়াই তুঙ্গে।

২৪ পরগণা জেলা কমিটিকে একসময় প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। হাওড়ায় তিনটি গ্রুপে ত্রিমুখী লড়াই চলছে। হুগলিতে বিজয় মোদকের বিরুদ্ধে রাজ্য নেতৃত্ব গোষ্ঠী চক্রকে মদত দিচ্ছেন। তবে এখনও তেমন মাথাচাড়া দিতে পারছে না।

বর্ধমানে বিনয় চৌধুরী, রামনারায়ণ গোস্বামী এবং বিনয় কোঙার—তিনজন তিনটি গোষ্ঠীর নেতা।

বাঁকুড়ার প্রবীণ নেতা অশ্বিনী রাজ, মেদিনীপুরে সুকুমার সেনগুপ্ত এবং পুরুলিয়ায় নকুল মাহাত কোণঠাসা। এই তিন জেলায় অধ্যাপক আর মাধ্যমিক শিক্ষকরা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। বাঁকুড়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ দে, মনোরঞ্জন মণ্ডল আর আশিস মুখার্জির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ পার্টিতে ভাঙন ডেকে এনেছে। তার সঙ্গে আছে ঢালাও দুর্নীতির অভিযোগ।

মেদিনীপুরে অধ্যাপক দীপক সরকার এবং শিবরাম বসুর মধ্যে লড়াই চলছে জোর।

সি পি আই (এম)-এর গোষ্ঠী লড়াই-এর অনেক তথ্য আছে। ধারাবাহিকভাবে লেখার মত কাহিনী। কিন্তু পার্টির রাজ্যস্তরের নেতারাও এক একটি গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে পার্টির ভিতরে নিজেদের মসনদ পাকা করার চেষ্টা করছেন। একবারও বুঝতে পারছেন না ক্ষমতায় যতদিন আছেন ততদিন


বিতর্কিত বিধায়ক বনমালী দাস

এই পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা ভিয়েতনাম মনে করতে পারেন, কিন্তু যেদিন ক্ষমতা চলে যাবে সেদিন ইন্দোনেশিয়া হওয়াটা কি একেবারেই অসম্ভব?

বীরভূম জেলার নানুর কেন্দ্রের এম এল এ বনমালী দাস কি সত্যিই রাজনৈতিক আদর্শের দংশনে দলত্যাগ করেছেন? নাকি সি পি আই (এম) দুর্নীতির প্রমাণ হাতে পেয়ে তাঁকে বিতাড়িত করল? বীরভূম বিশেষ করে বোলপুর, কীর্ণাহার, লাভপুর এবং নানুরে আর একটি কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। সে কাহিনী হল জেলার মন্ত্রী সুনীল মজুমদারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন ছাপোষা প্রাথমিক শিক্ষক বনমালী দাস। আদ্যোপান্ত তদন্ত হলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। কান টানতে অনেকগুলো মাথা এসে যাবে। জেলা নেতৃত্ব কৈফিয়ৎ চেয়ে বনমালীবাবুকে যত চিঠি বা নোটিস দিয়েছেন, তার একটিতেও দুর্নীতির কোন কথা নেই।

বনমালী দাস একা নন, বীরভূমে অন্তত তিনশো সি পি আই (এম) নেতা ও কর্মী দল ছেড়ে সি পি আই-তে যোগ দিয়েছেন। সি পি আই (এম) নেতারা মোটেই আপত্তি করেননি, 'দেখে নেব' কিংবা 'শেষ হয়ে যাবে' অথবা 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলে চিৎকার-চেঁচামেচি করেননি। তাহলে বনমালী দাসকে নিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট-বউবাজারে এত কবির লড়াই চলছে কেন? বনমালী দাস সি পি আই-তে যোগ দিলে সি পি আই (এম) নেতা সরোজ মুখার্জিরই বা আপত্তি কেন?

বোলপুরের খুব পুরনো সাপ্তাহিক তারাপ্রসন্ন সিংহরায় সম্পাদিত 'পল্লীশ্রী' সব ফাঁস করে দিয়েছে।

বনমালীবাবু ১৯৫৩ সালে অবিভক্ত সি পি আই-এর সদস্য হয়েছিলেন। বত্রিশ বছর পার্টি করার পর এখন তাঁকে দুর্নীতির দায়ে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। বনমালীবাবু ১৬ অক্টোবর হ্যাণ্ডবিল ছেড়েছেন। তাতে তিনি লিখেছেন:

'যখন গত ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভেঙে এসে সি পি আই (এম) গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম যে সি পি আই সংশোধনবাদী, সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা পার্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাই সি পি আই (এম)-কে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে নানুর থানায় গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। কিন্তু ২০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখছি, যে চিন্তা ও আদর্শ নিয়ে সি পি আই (এম) গড়ে তোলা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভুল। সি পি আই (এম) পেটি বুর্জোয়া পার্টি, সাম্যবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত।

'তাই ৩২ বছর আগে সাম্যবাদের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলাম, আজ আবার সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে এবং শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পুনরায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসার সংকল্প নিচ্ছি। সি পি আই (এম)

কর্মীদের অহ্বান করছি—চিন্তা করতে বলি যে পেটি বুর্জোয়া বাগাড়ম্বরপূর্ণ সি পি আই (এম)-এ থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আমি সি পি আই (এম) পরিত্যাগ করছি এবং সাম্যবাদী আদর্শের মূল পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সঙ্কল্প ঘোষণা করছি।

'এই পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদ ও শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদের উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে লড়াই করছে।

'সি পি আই (এম)-এর সকল সদস্যকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি এবং সি পি আই (এম) ছেড়ে দিয়ে সি পি আই-তে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

বনমালীবাবু ১৬ অক্টোবর এই বিবৃতি দেবার পর নতুন করে আর কোন কথা বলতে রাজি নন।

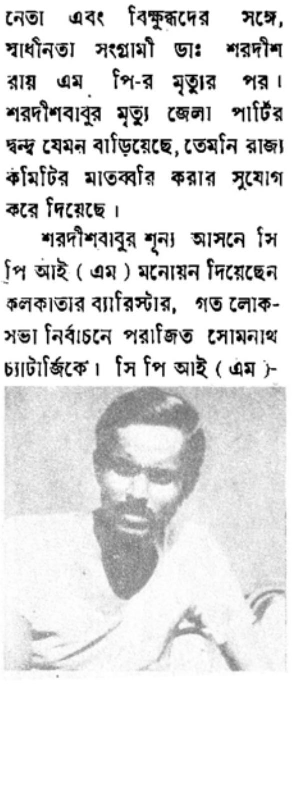
সি পি আই (এম)-এর জেলা কমিটির নেতা অধ্যাপক প্রশান্ত মুখার্জির সঙ্গে দেখা হল। প্রথমে তিনি বলেছিলেন, যা বলার সব জেলা কমিটির সম্পাদক অরুণ চৌধুরী বলবেন। পরে অবশ্য পার্টির অভিযোগ সম্পর্কে বললেন, বনমালীবাবু যে দুর্নীতিগ্রস্ত তার অনেক প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। বনমালীবাবু একজন প্রাথমিক শিক্ষক। অত বড় সংসারটা চালান কী করে? তিন ছেলের কেউ চাকরি করে না। দুই মেয়ে। নানুর থানার পার্টি দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল বনমালী দাসের উপর। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন বনমালীবাবুর ছেলে অরুণ দাস। দুর্নীতি হয়েছে পঞ্চায়েতের টাকা নিয়ে।

প্রশান্তবাবুর অভিযোগ হল: 'পঞ্চায়েত প্রধান থাকার সময়ে তহবিল তছনছ করা হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্কের পরোটা শাখায় অরুণবাবুর নামে জমা পড়েছে ২,০৫০.৫১ টাকা। পঞ্চায়েতের অডিটে ধরা পড়েছে পঞ্চায়েত তহবিল থেকে বনমালীবাবুকে পাঁচ হাজার টাকার মত এবং অরুণবাবুকে ৩১ হাজার টাকার মত আগাম দেওয়া হয়েছে। এ সবই ধরা পড়েছে গত আগস্ট মাসে। অরুণবাবু প্রধান ছিলেন ১৯৮৩ সালের মে মাস পর্যন্ত। এরপর সি পি আই (এম) প্রধান করেছে নতুন একজনকে। তবে বনমালীবাবুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ছাড়া আরও দুটি অভিযোগ আছে। এক, উপদলীয় চক্রান্ত। দুই, অন্য পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। এই তিনটি অভিযোগ সম্পর্কেই বনমালীবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। বনমালীবাবু কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে ১৬ অক্টোবর পদত্যাগ পত্র পাঠান, আমরা সেই পদত্যাগপত্র পাই ২৪ অক্টোবর। তার আগে বনমালীবাবুকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।'

এর অনেক আগে ২৭ সেপ্টেম্বর 'পল্লীশ্রী'-তে খবর বের হয়, 'নানুরের এম এল এ কি সাসপেণ্ড হচ্ছেন?' অভিযোগ ছিল, 'পূর্বপার্টিতে অবস্থিত শ্রীনারায়ণ রাইস মিলের মালিকের কাছে জমি এবং দু লক্ষ টাকা নিয়ে একটি পেট্রল পাম্প খোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।' এরপর ৪ অক্টোবর খবর বের হল, 'জেলার সি পি আই নেতা দুর্গা ব্যানার্জি বনমালীবাবুর বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করেছেন। ওদিকে মন্ত্রী সুনীল মজুমদার বনমালী দাসকে সাসপেণ্ড করার জন্য আঁটঘাট বেঁধে তৈরি হচ্ছেন। এখন দেখার, কে আগে কী করতে পারেন।'

বনমালীবাবুর সম্পর্কে সি পি আই (এম) নেতারা যাই বলুন, জেলায় গোষ্ঠী লড়াই চলছে অনেক দিন থেকে। দুর্নীতির কোপে পড়েছেন পার্টির অনেক নেতা এবং কর্মী। লড়াইটা জমেছে প্রবীণ নেতা এবং বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে, স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ শরদীশ রায় এম পি-র মৃত্যুর পর। শরদীশবাবুর মৃত্যু জেলা পার্টির দ্বন্দ্ব যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি রাজ্য কমিটির মাতব্বরি করার সুযোগ করে দিয়েছে।

শরদীশবাবুর শূন্য আসনে সি পি আই (এম) মনোনয়ন দিয়েছেন কলকাতার ব্যারিস্টার, গত লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত সোমনাথ চ্যাটার্জিকে। সি পি আই (এম)-এর অনেক নেতা—অরুণ চৌধুরী, ব্রজ মুখার্জি, প্রশান্ত মুখার্জির এম পি হওয়ার বাসনা ছিল। কিন্তু গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সবার আশায় ছাই দিয়েছে।



বনমালী পুত্র অরুণ দাস

কথা উঠেছিল বর্ধমান জেলার জঙ্গী নেতা বিধায়ক নিখিলানন্দ সরকে দাঁড় করান হবে। সেটা সম্ভব হয়নি। তাহলে বীরভূম জেলার ক্ষমতাসীন নেতারা রাজ্য কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন।

যাই হোক, বনমালী দাস এবং তাঁর পুত্র অরুণ দাসকে জব্দ করার জন্য অনেকদিন—সেই ১৯৮০ সাল থেকে চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে পাটনীল গ্রামে গণধর্ষণ, লুঠতরাজ, আগুন লাগানর অনেক বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বনমালী দাসকে জেলা নেতৃত্ব ১৯৮২ সালে বিধানসভায় মনোনয়ন দিতে চাননি। সেজন্য নানুরে পার্টির কর্মী এবং সমর্থকরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখান। শেষ পর্যন্ত রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তর নির্দেশে জেলা নেতৃত্ব বনমালীবাবুকে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হন। এরপর জেলা নেতৃত্ব বনমালীবাবুকে জব্দ করার জন্য দুর্নীতি, পার্টি বিরোধী কাজ ইত্যাদি নানা রকম অভিযোগ তুলেছেন। বনমালীবাবুকে ডেকে নিয়ে যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে। বনমালীবাবুর সমর্থকদেরই একজন কথায় কথায় অভিযোগ করেছেন, মন্ত্রী সুনীল মজুমদার ধমক দিয়ে বলেছেন, 'বনমালীবাবুকে চেয়ারে বসতে দেবেন না। দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনার বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে।' কিন্তু কী অভিযোগ তা জানা গেল না। নানুরে বনমালীবাবুর বিরুদ্ধে কমিশন বসল। কোন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেল না।

এবার বনমালীবাবুরা উঠে পড়ে লাগলেন। জেলা কমিটির সম্পাদক অরুণ চৌধুরী থেকে এম পি গদাধর সাহা, প্রশান্ত মুখার্জি, সুনীল মজুমদার, জ্যোৎস্না মজুমদার প্রমুখ নেতা এবং তাঁদের পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে সন তারিখ সব কিছু উল্লেখ করে ভূরি ভূরি অভিযোগ করলেন রাজ্য কমিটির কাছে। কয়েকজন প্রবীণ নেতার কাছে দরবার করলেন যাতে অন্তত প্রাথমিক তদন্ত হয়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!



বনমালীর অনুগামী মঙ্গল মেটে

শেষ পর্যন্ত নানুর থানার প্রায় পঞ্চাশজন পার্টি সদস্য একে একে দল ছাড়লেন। বনমালীবাবুর ডানহাত মঙ্গল মেটেও জ্যোৎস্না মজুমদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-দলবাজি, উদ্ধত আচরণের অনেক অভিযোগ করেছেন।

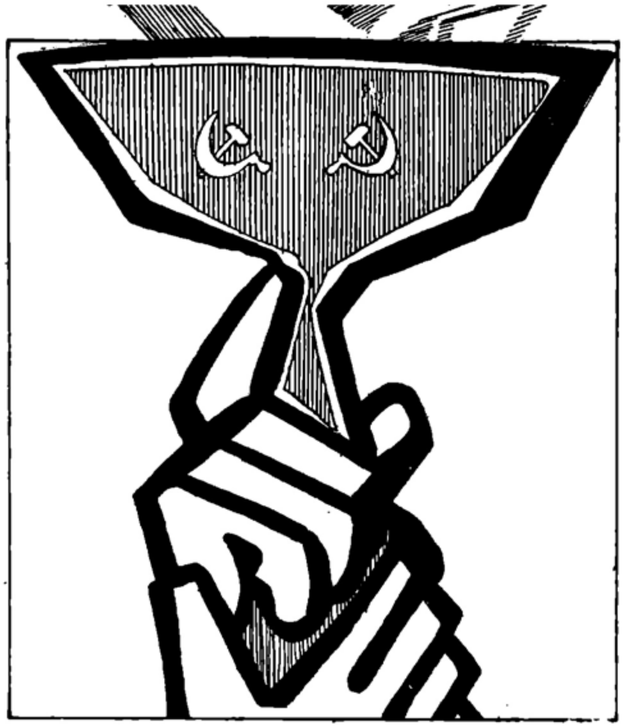
বোলপুরে সি পি আই (এম) অফিসে এবং বাইরে অনেক অভিযোগ শুনেছি—বনমালীবাবু তিন তলা বাড়ি করেছেন, ধানকল, চিমনিকল, পেট্রল পাম্প করেছেন। জুবুটিয়া গ্রামে বনমালীবাবুর বাড়ি। দুটো বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে মাঠ কোঠা বাড়ি। বীরভূমের লালমাটি, মোটা দেওয়াল, বনমালীবাবু এখনও প্রাথমিক শিক্ষক, পুত্রবধূও শিক্ষিকা, বিঘে সাত-আট চাষের জমি আছে। উঠোনে গম শুকোচ্ছিলেন বনমালীবাবুর স্ত্রী। এম এল এ হওয়ার পর বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো, স্যানিটারি ল্যাট্রিন আর একটা টিউবওয়েল হয়েছে। দেমাকের তেমন কিছু চোখে পড়েনি। চাল চলনে গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়নি।

সি পি আই (এম) নেতা প্রশান্তবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, বনমালীবাবু এবং তাঁর পুত্র অরুণ দাস ছাড়া আর কোন এম এল এ নেতা কিংবা কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাননি? তিনি সোজা উত্তর দিলেন, না।

গত ৩ নভেম্বর ময়ূরেশ্বরে সি পি আই-এর কর্মী সম্মেলনে সি পি আই নেত্রী গীতা মুখার্জি এম পি, সি পি আই (এম) নেতাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন পার্টির সদস্য অন্য কোন দলে যাবেন সেটা তাঁর মৌলিক অধিকার। সি পি আই (এম) কি সকলের মৌলিক অধিকার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে? সি পি আই (এম) তো সি পি আই-এর বহু কর্মীকে আশ্রয় দিয়েছে। আমরা তো হৈ চৈ করিনি। □

বিশেষ প্রতিনিধি

ফটো: লেখক



আমাদের রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি কী করে গড়ে উঠল ?

সেটা ১৯৩১ সাল। ৪১ নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে তিনতলার একটা ছোট্ট ঘর। আসলে ওখানে থাকতেন দু'জন মেডিক্যাল ছাত্র—নূর মহম্মদ আর অতুল চন্দ। তাঁদের একখানা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেকালের বিশিষ্ট বিপ্লবী আবদুল হালিম। ওই ঘরটাই তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তর এবং নেতা ও কর্মীদের আবাস। একটা মাদুর, ছোট একটা শতরঞ্জি, তোশক, বালিশ আর চাদর। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার দুই দক্ষ কারিগর আবদুল হালিম আর মুজফফর আহমদ। দুজনেই সাধাসিধে মানুষ। তবে হালিম সাহেবের পোশাক ছিল সাদামাটা। মুজফফর আহমদ সব সময় কোট প্যান্ট পরতেন। তার সঙ্গে লাল রং-এর টাই। পার্টি কর্মীরা লাল টাই দেখে ভাবতেন, এটাই বোধহয় বড় কমিউনিস্ট নেতার পোশাক। মুজফফর আহমদ সাহেবের মাটিতে বসতে অসুবিধা হবে বলে নূর মহম্মদ এবং অতুল চন্দ একখানা চেয়ার এনে দিয়েছিলেন।

তখন অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বা কর্মী জনা চল্লিশ। চাল নেই, চুলো নেই, আছে শুধু স্বপ্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন। বিখ্যাত পরিবারের সব ছেলে লেখাপড়ায় প্রথম সারির। কেউ অনুশীলন পার্টি, কেউ যুগান্তর, কেউ শ্রীসংঘ, অভয় আশ্রমে রাজনীতির পাঠ নিয়েছেন। সকলেই দুবার করে জেলের ভাত খেয়ে এসেছেন। সংসার জীবনে সোজা পথে চললে এ'দের জীবনে অর্থের দিক, সামাজিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত। কিন্তু সমাজবাদ, কমিউনিজমের ভাবধারা ওঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সে সময় কমিউনিস্টরাও কাজ করতেন কংগ্রেসের মধ্যে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮—কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ বলতে গেলে স্বর্ণযুগ। বঙ্কিম মুখার্জি, সতীশ পাকড়াশী, গণেশ ঘোষ, নিরঞ্জন সেন, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, নেপাল নাগ, সরোজ মুখার্জি, আবদুল্লাহ রসুল, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, কমল সরকার, কৃষ্ণপদ ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখার্জি, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, নৃপেন চক্রবর্তী, শচীগোপাল ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন



২৪৯ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের এই বাড়িতে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উড়েছিল / অচিন্ত্য রায়

রায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিজয় মোদক, নিশি চক্রবর্তী, ইন্দু ভৌমিক, নিত্যানন্দ চৌধুরী, আবদুল মোমিন, কনক দাশগুপ্ত, ডাঃ রমেন সেন, সরোজ রায়, ভূপাল পাণ্ডা, লতিকা সেন, মহঃ ইলিয়াস, মহঃ ইসমাইল, জ্যোতি দাশগুপ্ত, হীরেন মুখার্জি, হাওড়ার জীবন মাইতি, নরেশ দাশগুপ্ত, জয়কেশ মুখার্জি, ২৪ পরগণার প্রভাস রায়, নীরেন ঘোষ, হুগলির কালী ঘোষ, তিনকড়ি মুখার্জি, পরিতোষ চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন হাজরা, মহীতোষ নন্দী, সুশীতল রায়-চৌধুরী, নদীয়ার অমৃতেন্দু মুখার্জি, সমরেন্দ্র সান্যাল, বাঁকুড়ার অশ্বিনী রাজ, মেদিনীপুরের সুকুমার সেনগুপ্ত, বর্ধমানের শহীদুল্লাহ, সুবোধ চৌধুরী, মনসুর হাবিবুল্লাহ, শিবশঙ্কর চৌধুরী, রবীন সেন, এমনি অনেক কৃতী ছাত্র, আদর্শবান কিশোর তরুণ ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এ'দের অনেকেই তখন কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মকর্তা। হীরেন মুখার্জি, বঙ্কিম মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জি প্রমুখ ছিলেন এ আই সি সি-র সদস্য। প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক। প্রভাস রায় ছিলেন ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক।

বর্ধমানে স্বদেশি আন্দোলনে প্রথম যিনি কারাবরণ করেছিলেন, তিনি সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখার্জি।

সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র—কৃতী ছাত্র বললেই লোকে ধরে নিত কমিউনিস্ট পার্টির ছেলে। সেকালে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বা প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ কিংবা পরবর্তীকালের 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে।

সন্ত্রাসবাদ, বিপ্লববাদ ছেড়ে যাঁরা মার্কসবাদী হয়েছেন তাঁদের সক্রিয়ভাবে অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন অ-কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা।

একদল বৃটিশের কারাগারে বন্দী হয়ে মার্কসবাদ পড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। একদল যাঁরা সরাসরি এসেছেন নানান বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে। আর একদল এসেছিলেন বিদেশ থেকে রজনীপাম দত্তের কাছ থেকে রাজনীতির পাঠ নিয়ে।

প্রথমদিকে মুজফফর আহমদ ছাড়া কেউ কমিউনিস্ট পার্টিতে ঠাঁই দিতে পারতেন না। মুজফফর আহমদ কমিউনিস্ট পার্টিতে 'কাকাবাবু' নামেই পরিচিত। প্রথমদিকে তিনি সবাইকে বাজিয়ে নিতেন—সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন কিনা, কোন বুর্জোয়া চিন্তাধারা আছে কিনা, পার্টিকে সবার উপরে স্থান দিতে পারবেন কিনা ইত্যাদি। তারপর

হয় কোন শ্রমিক এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে, না হয় গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক সংগঠন করতে হবে।

সারা দেশে তখন চারটি প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন—বাংলায় মুজফ্ফর আহমদ, বোম্বাই-এ এস এ ডাঙ্গে, উত্তর প্রদেশে পূরণচাঁদ যোশী এবং মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার।

১৯২৮ সাল শুধু বাংলা নয়, সারা দেশের পক্ষে একটা ঐতিহাসিক বর্ষ। হাওড়ায় কয়েকটি চটকলে এবং রেলওয়েতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। তখন নেতা ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, কালিদাস ভট্টাচার্য, কিরণ মিত্র (জটাধারী বাবা নামে পরিচিত), রাধারমণ মিত্র, আবদুর রেজ্জাক খাঁ এবং শিবনাথ ব্যানার্জি।

১৯২৬ সালে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি গঠিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে সারা বাংলায় কলেজ ছাত্ররা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ছাত্র ধর্মঘট করে।

এই সময় আরও দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এক, কলকাতায় সাইমন কমিশন বিরোধী বিশাল মিছিল এবং দুই, কলকাতায়



কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এম এন রায়



বিখ্যাত বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন।

ওই সময় ইংরেজ সরকার শাসন সংস্কারের নামে কৌশল করে স্যার জন সাইমনকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। সারা দেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। সারা বাংলা ফেটে পড়ে বিক্ষোভে। কলকাতায় সাইমনের আগমনকে ধিক্কার জানাতে যে মিছিল বের হয় তা অভূতপূর্ব। সেই বিক্ষোভ জনমনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রোষের আগুন জ্বালায়।

এরপরেই কংগ্রেসের অধিবেশন বসে পার্ক সার্কাসে। এই অধিবেশনে দক্ষিণ পন্থী এবং বামপন্থীদের মত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বামপন্থীদের সমর্থনে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হন। বামপন্থীদের মনোবল বেড়ে যায়। কংগ্রেসের ভিতর কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সদস্যরা, সুভাষচন্দ্র বসুকে মহাত্মা গান্ধীর আপসকামী মনোভাবের বিরুদ্ধে সমর্থন করেন।

১৯২৬ সালেই প্রথম শিল্প বিরোধ আইন তৈরি হয়েছিল। ১৯২৮ সালে শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। বঙ্কিম মুখার্জি, রাধারমণ মিত্র, মৃণালকান্তি বসু, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, শিবনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতারা জোরদার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলেন। বঙ্কিমবাবু ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন খুবই সামান্য একটা দল। আসলে মুজফ্ফর সাহেবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর পার্টি চলত। মুজফ্ফর সাহেব যদি বঙ্কিমবাবু, রাধারমণ মিত্র, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী প্রমুখকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিতেন তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি অনেক আগে একটা শক্তিশালী দল হয়ে উঠতে পারত। আসলে মুজফ্ফর আহমদের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে তখন পার্টিতে সদস্য হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন চারজন—মুজফ্ফর আহমদ, আবদুল হালিম, আবদুর রেজ্জাক খাঁ এবং শামসুল হুদা।

অনুশীলন দলের কিছু তরুণ বিপ্লবী মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 'ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ' গঠন করেন। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ধরণী গোস্বামী। পরবর্তীকালে এই লীগ থেকে মণি সিং, নীরোদ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় শর্মা, গোপেন

চক্রবর্তী প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

এই ১৯২৮ সাল আরও অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ভারতে গোপনে বিদেশ থেকে মার্ক্সবাদ সম্পর্কিত মূল্যবান বই আসতে থাকে। সেই সঙ্গে আসেন মার্ক্সবাদে সুপণ্ডিত কয়েকজন বিনয়ী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি।

ভারতে মার্ক্সবাদ প্রচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই বিখ্যাত বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। কার্ল মার্ক্সের 'ডাস ক্যাপিট্যাল'-এর ভাবানুবাদ করেছিলেন রেবতী বর্মন। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে প্রথম সাহিত্য সমালোচনা করেন অধ্যাপক নীরেন রায়।

দুই কমিউনিস্ট পার্টির অনেক রথী-মহারথী ডঃ ভূপেন দত্তর কাছে মার্ক্সবাদ শিক্ষা নিয়ে কমিউনিস্ট হয়েছেন। কিন্তু মুজফফর আহমদ ডঃ দত্তকে কখনও সম্মান দিতে পারেননি। তার কারণ বোধহয় একদিকে ডঃ দত্তর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠা এবং সততা। অন্যদিকে মুজফফর সাহেবের নেতৃত্ব করার মত অভিজ্ঞতার অভাব। মুজফফর সাহেব তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে কোন রাজনৈতিক নেতার সম্পর্কেই ভাল মন্তব্য করেননি। বিরূপ মন্তব্যই বেশি।

ডঃ দত্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি। কিন্তু অনেক ছেলেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ডঃ দত্তর পরামর্শেই সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখার্জি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

রেবতী বর্মন আজীবন মার্ক্সবাদের চর্চা করেছেন, মূল্যবান বই



মুজফ্‌ফর আহমদ

লিখেছেন। প্রকাশ করেছেন তাঁর বর্মন পাবলিশিং-এর মাধ্যমে। শেষ জীবনে রেবতীবাবু কুষ্ঠ রোগে পঙ্গু হয়ে কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছিলেন।

সে যুগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত ছিলেন অনেকেই। ভবানী সেন তাঁদের অন্যতম। বলতে গেলে পি সি যোশী এবং ভবানী সেনের চেষ্টায় বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত যুবকরা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। ভবানীবাবু একসময় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'বুর্জোয়া কবি।' নীরেনবাবু ভবানীবাবুর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তার জন্য নীরেনবাবুর পার্টি সদস্যপদ খারিজ করা হয়েছিল!

অথচ এই ভবানীবাবুই পরবর্তীকালে গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত হয়ে ওঠেন। সেকালে পার্টিতে যোগ না দিলেও শিল্পী, সাহিত্যিক, সুরকাররা অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির পাশে দাঁড়িয়েছেন, সাহায্য করেছেন। যেমন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গীতে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মদত দিয়েছেন।

পঙ্কজ মল্লিক, সুধী প্রধান, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অমলাশঙ্কর প্রমুখ শিল্পীরা কমিউনিস্ট পার্টিকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চালানর জন্য যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাতে এঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

১৯২৮ সালে ঝরিয়ায় জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এ আই টি ইউ সি-র অধিবেশন হয়। তখন এ আই টি ইউ সি-ই একমাত্র শ্রমিক সংগঠন যেখানে সব দলই ছিল। ১৯৪৭-এর ৩ মে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেসের গান্ধীবাদীরা এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে এসে আই এন টি ইউ সি গঠন করেন।

এর আগে বি টি রণদিভে (বর্তমানে সি পি আই (এম) নেতা) এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন করেন। পরে অবশ্য 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন' ভেঙে দিয়ে আবার এ আই টি ইউ সি-তে যোগ দেন। রণদিভেকে একবার সি পি আই থেকেও বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত হয়।

১৯২৯ সালে রাপ্তি নদীর তীরে



আবদুল হালিম

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টিতে কখন কে হাল ধরেছিলেন

ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯২১ সালে। তবে সি পি আই (এম) স্বীকার করে নিয়েছেন, কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর, সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দে। মানবেন্দ্রনাথ রায় সহ সাতজনকে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সম্পাদক হন মহম্মদ শফিক সিদ্দিকি।

১৯২১ সাল। তখন অবিভক্ত বাংলায় সি পি আই-এর সম্পাদক হিসাবে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন মুজফফর আহমদ। ১৯২৯ সালের মার্চে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি বন্দী হবার পর সম্পাদক হন আবদুল হালিম। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পার্টির পরিধি ছিল কলকাতার মধ্যেই। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা, হুগলি বর্ধমান এবং পরে যশোহর জেলা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে প্রথম গোপনে পার্টি অধিবেশন হয় মেটিয়াবুরুজে এবং সম্পাদক হন একজন শ্রমিক, মণি চ্যাটার্জি। ১৯৩৬ সালে সম্পাদক হন গোপেন চক্রবর্তী (এখন মস্কোয় থাকেন)। দ্বিতীয় গোপন সম্মেলন হয় চন্দননগরে, ১৯৩৮ সালে। সম্পাদক হন নৃপেন চক্রবর্তী (বর্তমানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী)। নৃপেনবাবু গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৩৯ সালে পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী সম্পাদক হলেন। তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৪০ সাল থেকে ৪৩ পর্যন্ত রাজ্য সম্পাদক ছিলেন মুজফফর আহমদ।

বাংলা প্রাদেশিক কমিটির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হয় ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে, ভারত সভা হলে। এটাই ছিল তৃতীয় সম্মেলন। সম্পাদক নির্বাচিত হন ভবানী সেন। ৪র্থ রাজ্য সম্মেলন কলকাতায়, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে। সম্পাদক হন ডাঃ রণেন সেন।

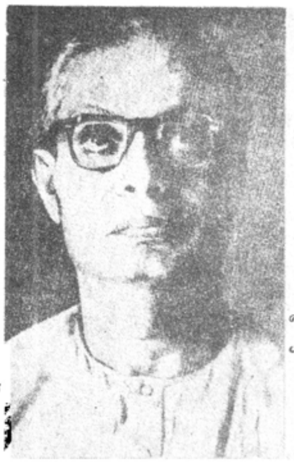
এরপর ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। রাজ্য কমিটি ভেঙে দিয়ে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে সম্পাদক মনোনীত হন মহম্মদ ইসমাইল। রাজ্য কমিটিও মনোনীত হয়।

১৯৫১ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মুজফফর আহমদ আবার রাজ্য কমিটির সম্পাদক হন। ১৯৫৩ সালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পার্টি হঠকারী লাইন ছেড়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। বি টি রণদিভেকে সরিয়ে সাধারণ সম্পাদক করা হয় অজয় ঘোষকে। কলকাতায় রাজ্য সম্মেলনে সম্পাদক নির্বাচিত হন জ্যোতি বসু। জ্যোতিবাবু তখন পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক। তাঁর জায়গায় স্বাধীনতার সম্পাদক হন ভূপেশ গুপ্ত। এরপর ৯টি সম্মেলন হয়েছে। ১৯৬৪ সালে পার্টি দুভাগ হয়েছে।

ষষ্ঠ সম্মেলন—কলকাতা, ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে। সম্পাদক জ্যোতি বসু। কলকাতায় ১৯৫৬ সালে সপ্তম এবং ১৯৫৮ সালে অষ্টম সম্মেলন হয়েছে। ১৯৬১-র আগে পর্যন্ত জ্যোতিবাবুই ছিলেন সম্পাদক। ১৯৬১-তে বর্ধমান, ১৯৬৪-তে কলকাতা, ১৯৬৮-তে দমদম, ১৯৭২ সালে মেদিনীপুর, ১৯৭৮ এবং ১৯৮১-তে কলকাতায়—অর্থাৎ দীর্ঘ ২১ বছরে ৬টি সম্মেলনে সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। ১৯৮২-র ২৯ নভেম্বর প্রমোদ দাশগুপ্তর মৃত্যুর পর রাজ্য কমিটির সম্পাদক হন সরোজ মুখার্জি। সরোজবাবুই পার্টির সবচেয়ে পুরনো সদস্য।

১৯৪৩ সালের ২৩ জুলাই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা প্রকাশ্যে প্রথম উঠেছিল ২৪৯ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের ছাদে। ওই বাড়িতেই একখানা ঘরে ছিল পার্টির রাজ্য কমিটির অফিস। □

বঙ্কিম মুখার্জি



সোমনাথ লাহিড়ী



লাহোর কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং স্বাধীনতার সঙ্কল্প গৃহীত হয়। তারপর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছে।

১৯২৯ সালের মার্চে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন দাসের মৃত্যু, নিখিল ভারত যুব সম্মেলন ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান, ১৮ মার্চ সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল প্রভৃতি ঘটনা বাংলার হাজার হাজার তরুণকে বিপ্লবের পথে টেনে আনে।

সেদিনের বিপ্লবী তরুণদের একটা বড় অংশ আজকে দুই কমিউনিস্ট পার্টি, আর এস পি এবং অন্যান্য মার্ক্সবাদী দলের নেতা।

জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আপস বিরোধী এবং বামপন্থী ভাবধারা কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তুলতে সবরকমে সাহায্য করেছে। সূর্য সেনের অনুগামী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত (পরে কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশীর সঙ্গে বিয়ে হয়) কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বাংলার বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলিও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্থান হয়নি।

১৯২৮ থেকে ১৯৪০—এই ক-বছর বাংলার জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে অকমিউনিস্ট এবং স্বাধীনতাকামী আপস বিরোধী নেতাদের নেতৃত্বে। কংগ্রেস তখন একটা প্ল্যাটফর্ম। যাঁরা কংগ্রেস, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি, শ্রীসংঘ, অনুশীলন পার্টি, যুগান্তর, অভয় আশ্রম প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও অনেকে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে। তার আগে ১৯৩৭-৩৮ সালে বন্দী মুক্তির পর হাজার হাজার তরুণ কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসে ভাঙন, ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম এবং ১৯৪০ সালে আর এস পি-র জন্ম হয়। বিদেশে যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন যেমন জ্যোতি বসু, নিখিল চক্রবর্তী, স্নেহাংশু আচার্য, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, রেণু রায় (চক্রবর্তী) প্রমুখ ১৯৩৯ থেকে ৪২-এর মধ্যে স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর ডাকে 'আপস বিরোধী সম্মেলনে' যোগ দিয়েছিলেন ই এম এস নামবুদিরিপাদ, পি রামমূর্তি, জ্যোতি বসু, ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী, ভরদ্বাজ, আবদুল হালিম, ডাঃ রণেন সেন, চিন্মোহন সেহানবিশ প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টি প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সংঘের নামে এই বাংলায় হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্দনলাল সায়গল, পৃথ্বীরাজ কাপুর, বলরাজ সাহনি, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শান্তি বর্ধন, সুধী প্রধান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, হিরণ সান্যাল, বিষ্ণু দে, নীরেন রায়, পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, সলিল চৌধুরী, সমরেশ বসু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট লেখক এবং শিল্পীদের সমাবেশ ঘটেছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন বিনয় রায়। তখন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্বে ছিলেন চিন্মোহন সেহানবিশ।

এঁরা অনেকে কমিউনিস্ট না হয়েও কমিউনিস্ট ভাবধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

বহুজনের অকল্পনীয় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, প্রচণ্ড পরিশ্রম আর নিঃস্বার্থ অবদানের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। তিরিশের দশকে পার্টি হোলটাইমাররা পেতেন মাসে ৭ টাকা। ১৯৪৩ সালে সেই অঙ্ক বেড়ে হল ২৫ থেকে ৫০ টাকা। এই সময় পার্টির বেশ কিছু কমিউন তৈরি হয়। বাড়ি ঘর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে পার্টি কর্মীরা কমিউনে এসে থাকতেন।

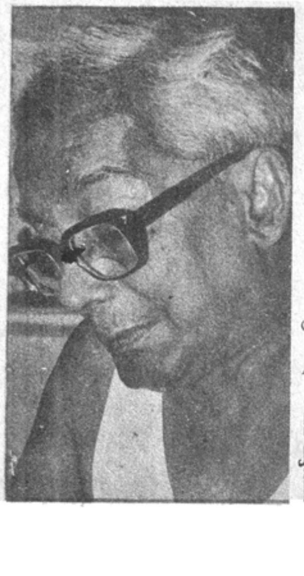
মাঝে মাঝে পার্টিকে প্রচণ্ড অর্থ সঙ্কটে পড়তে হয়েছে। পার্টির কর্মীরা একবেলা পেট ভরে খেতে পাননি। ১৯৩৭-৩৮ সালে পার্টির অর্থ সঙ্কট মেটাতে চাকরি নিয়েছিলেন অনেক নেতা এবং কর্মী। প্রমোদ দাশগুপ্ত চাকরি করতেন কলকাতা কর্পোরেশনের এণ্টালি ওয়ার্কশপে। সরোজ মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী ৪০-৫০ টাকা মাইনেতে বেশ কিছুদিন চাকরি করেছেন একটি পুস্তক প্রকাশনা সংস্থায়। সোমনাথ লাহিড়ী কৃতী ছাত্র, এম এসসি পাশ করে কর্পোরেশনে ব্লক সরকারের চাকরি নেন। উচ্চ শিক্ষিত লোককে কর্পোরেশনের চাকরি দেওয়ায় কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ হয়। কর্মীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তাহলে তো অশিক্ষিত লোক চাকরি পাবে না। সোমনাথবাবু অবশ্য বেশিদিন চাকরি করেননি।

সেকালের অনেক নেতা এবং কর্মী আজ আর নেই। আজীবন তাঁরা সহজ সরল জীবনযাপন করেছেন। পার্টি যখন ক্ষমতাসীন, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, গাড়ি, বাড়ির কোন অভাব নেই, তখনও তাঁদের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

আবদুর রেজ্জাক খাঁ



প্রমোদ দাশগুপ্ত



জ্যোতি বসু। ফটো: অচিন্ত্য হাজরা



সরোজ মুখার্জি। ফটো: অচিন্ত্য রায়



সংসারের পুরনো লোকের কয়েকজনের পরিবর্তন ঘটেছে অস্বাভাবিক। আচার-আচরণ, জীবনযাত্রায় তাঁরা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছেন।

১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার পর সি পি আই (এম) তেনালী কনভেনশনের প্রস্তাব মত সংগঠনের জন্য ২৫ হাজার টাকা তহবিল সংগ্রহের ডাক দিয়েছিল। আজকে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম)-এর সম্পত্তি ২৫ কোটি টাকার কম নয়। সেদিন মিটিং করতে হলে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ি থেকে চেয়ার টেবিল আনতে হত। আজকে মোজাইকের মিটিং হল শুধু নয়, আসবাব পত্র অনেক বহুজাতিক শিল্প সংস্থাকে হার মানায়। সব কিছু বদলে যাচ্ছে।



পার্টির রাজ্য সম্মেলন— দেওয়াল লেখা। ফটো: অচিন্ত্য রায়

একজন প্রবীণ নেতা কথায় কথায় বলছিলেন, 'তখন সারাদিন মাইলের পর মাইল হেঁটে অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়ে পার্টি গড়ার কাজ করে যে আনন্দ পেতাম আজ তা পাই না। রাত্রে চ্যাটাইতে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, পার্টির জন্য কতটুকু আর করলাম! আর আজকে কত কমরেডকে দেখছি, শুধু ক্ষোভ আর ক্ষোভ। পার্টিতে এসে বাড়ি করেছে, কাজ না করেও মাসে তিন হাজার রোজগার। পার্টির হোলটাইমার হয়েও মাস গেলে সংসারে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ।

'পার্টির কমরেডদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কোথাও একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে গিয়েছে। সেটা শুধু ক্ষমতা নয়, বড় পার্টি বলেও নয়, বিপ্লবী পার্টির একটা শিক্ষা থাকে, রুচিবোধ থাকে, সঙ্গতি থাকে —বোধহয় সি পি আই (এম) সেই অভাবের তাড়নায় দরিদ্র হয়ে পড়ছে।' □

নিশীথ দে

ফটো: সংগৃহীত

ঝিখিরার জয়চণ্ডী গড়চণ্ডী

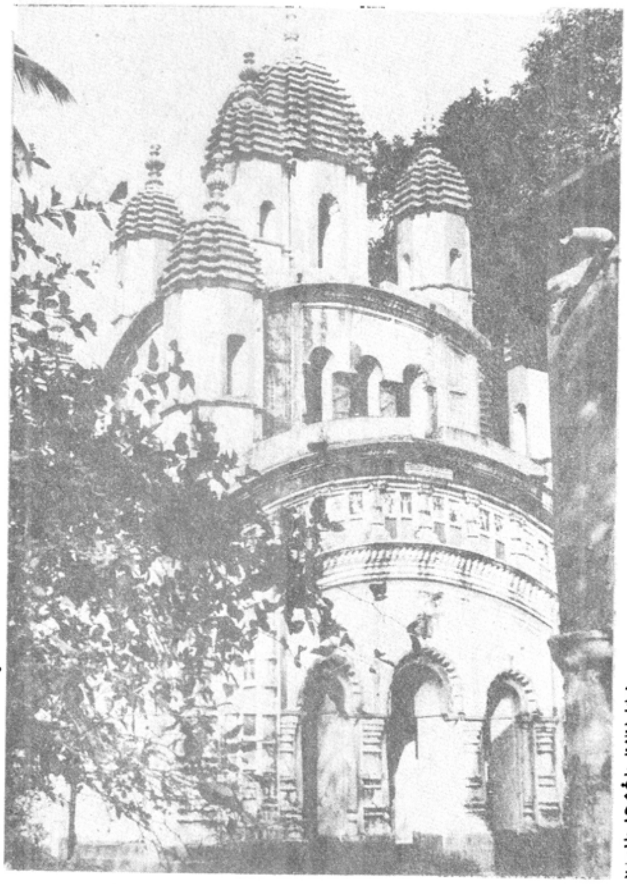
হাওড়া জেলার মানচিত্রের আকৃতির সঙ্গে ভারতের মানচিত্রের আকারের আশ্চর্য মিল। ভারতের মানচিত্রে যেখানে জয়সলমীরের সোনার কেল্লা, হাওড়া জেলার ঠিক সেই জায়গায় ঝিখিরা গ্রামের গড়। গড়ের চিহ্নও নেই, রয়েছেন অধিষ্ঠাত্রীদেবী গড়চণ্ডী, রয়েছে গড়চণ্ডী আর জয়চণ্ডীর নবরত্ন এবং আটচালা মন্দির। ঝিখিরা গ্রামটি হাওড়া-হুগলীর সীমানায়।

হাওড়া থেকে বাস-মিনিবাস আমতা হয়ে জয়পুর, অমরাগড়ি, রাউতাড়ার পাশ দিয়ে পৌঁছে যায় ঝিখিরা গ্রামে। গ্রামের পথে পথে অসংখ্য সমাধি-ফলক। মেদিনীপুরের কয়েকটি গ্রামে ছাড়া এ ব্যাপারটা অন্য কোথাও খুব বেশি দেখা যায় না। ঝিখিরা একটি আশ্চর্য জনপদ। গোটা গ্রামটিতে অনেকগুলো মন্দির, অনেক দেবদেবী একসঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় পূজিত হয়ে চলেছেন।

গড়চণ্ডী মন্দিরটির নির্মাণ হয় ইংরেজি ১৭৯৫ সালে। আগে এ মন্দির ছিল আটচালা। মন্দির-শীর্ষে লেখা : শ্রীশ্রীহরি শ্রীশ্রীশুভমস্তু শকাব্দা ১৭১৭ শক সন ১২০২ সাল। মন্দিরের দেওয়ালে সামনের দিকে সাধারণ পোড়ামাটি অলঙ্করণ, পেছনে বা ধারে কিছু নেই। মন্দিরের ভেতরে নিত্যপূজিতা দেবী গড়চণ্ডী বসে আছেন, হলুদ রঙ-করা কাঠের মূর্তি। লাল শাড়ি পরনে দেবীর পাশে মনসা ও শীতলার ঘট স্থাপিত। মন্দিরের চারপাশে নানা ধরনের গাছপালা পরিবেশটিকে ভাবময় করে তুলেছে। ছোট্ট দুটি মন্দিরের শিখর দেউলে 'বিশ্বেশ্বর' শিব ও 'শ্রীধরজীউ' শালগ্রাম রয়েছেন গড়চণ্ডীর নিত্য সঙ্গী হয়ে।

মন্দিরের সেবাইতমহাশয় জানালেন, এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দুর্বার খানের মেয়ে পদ্মাবতীর বংশধর। মন্দিরের উচ্চতা মাহেশের রথের উচ্চতার সমান।

কয়েকবছর আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল যাতে বোঝা যায় দেবী জাগ্রতা, ভক্তদের মনের বাসনা



ঝিখিরার গড়চণ্ডী মন্দির

পূরণ করেন যদি তা ন্যায্য হয়। শারদীয় পুজোর সময় খুব জাঁকজমক করে পুজো করা হয় গড়চণ্ডীর ও জয়চণ্ডীর। ষষ্ঠীর দিন মূর্তিকে নতুন শাড়ি যাঁর পরাবার কথা তিনি অবিশ্বাস করে এলেন না। পুরনো শাড়িই রইল মাতৃ-অঙ্গে। অষ্টমীর দিন ভোরে শহর থেকে দৌড়ে এলেন ভদ্রলোক, সঙ্গে দুটি নতুন শাড়ি। বললেন, কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখি মা বলছেন, আমাকে শাড়ি দিবি কেন, আমি তো কাঠের পুতুল, তাই না? ভোরে উঠে চেনা দোকানির বাড়ি গিয়ে তাঁকে দিয়ে দোকান খুলিয়ে এই শাড়ি নিয়ে আসছি! মাগো, সনাতন শুভ অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম—ক্ষমা কর মা!

গড়চণ্ডীদেবীর বোনের নাম জয়চণ্ডী। বোন নন, দিদি, কারণ জয়চণ্ডীই বড়, যেহেতু তিনি ঝিখিরা গ্রামের এই সরখেল পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আগে। সামনে বিরাট একটি জলাশয়, স্থানীয়দের ভাষায় জয়পুকুর। পুকুরের তিনদিকে সবুজ বনজঙ্গল আর গ্রাম্য কুটির। এ পারে জয়চণ্ডী মন্দিরটি প্রাচীন বাংলা রীতির আটচালা। কাঠের তৈরি এই জয়চণ্ডী মূর্তি আর গড়চণ্ডী একরকম দেখতে, সহোদরা বোনেরা যেমন অনেক সময় এক রকম দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস দুবোন দিনেমানে আলাদা আলাদা থাকলেও রাত্রে থাকেন একসঙ্গে।

কী করে সম্ভব?

জাগ্রত বিশ্বাসের চেতনায় অনেক কিছুই সম্ভব হয়। বিশ্বাসীরা স্বচক্ষে দেখেছেন রাত্রে গড়চণ্ডী মায়ের মন্দির থেকে একটি জ্যোতির্ময়ী দিব্য অস্তিত্ব বেরিয়ে এসে জয়চণ্ডী মন্দিরে প্রবেশ করেন।

জয়চণ্ডী মন্দির বানিয়ে দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুর্বার খানের বংশধর। সেটা ছিল ১৬৭২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫০ খৃস্টাব্দ। এ মন্দিরের মুখ পুকুরের দিকে। সামনের দেওয়ালে কার্তিক, গণেশ, দুর্গা প্রমুখ দেবদেবী আর ফুল লতা পাতার টেরাকোটা ফলক। খুব বেশি নেই, অনেকটাই খসে পড়েছে।

জয়চণ্ডীর এখনকার মূর্তিটি অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও প্রাচীন মূর্তি ছিল পাথরের; সুস্পষ্ট আকারহীন সেই মূর্তি মাটির নিচ থেকে খুঁজে পান সেনাপতি দুর্বার খান। বনের গভীরে ছোট্ট কুটিরাশ্রমে বাস করতেন একজন যাযাবর সন্ন্যাসী। তিনিও ওই মূর্তিটি একই সময়ে একই সঙ্গে দেখতে পান। এই নিয়ে সেনাপতিতে সন্ন্যাসীতে বেজায় ঝগড়া বাধে। সেনাপতি বলেন, আমি আগে দেখেছি এই মূর্তি, সন্ন্যাসী বলেন, আমিই আগে পেয়েছি মাকে। বনবাসী আমি, এই শিলামূর্তি আগে থেকেই আমার পরিচিত।

ঝগড়ার মীমাংসা করতে তাঁরা গেলেন হুশেন শাহের দরবারে। বিপদে পড়লেন হুশেন শাহ। একদিকে তাঁর নিজের লোক, আরেকদিকে এমন এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী যাকে এড়ান যায় না।

তিনি যেন ঝগড়া থামাবার জন্যই বললেন, ঠিক আছে, যিনি আপনাদের মধ্যে জয়চণ্ডী মূর্তির আসল মালিক, এই গরম শিকটি তাঁর হাতে ফোস্কা ফেলবে না! নিন ধরুন! এই বলে একটি উত্তপ্ত লোহার শিক এগিয়ে দিলেন তিনি।

পরাজিত হলেন প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্বার খান। বনের সন্ন্যাসীই আগে পেয়েছিলেন আদিমূর্তিটি। সন্ন্যাসী একদিন বিদায় নিয়ে চলে যান। তারপর অবশ্য দুর্বার খানই মালিক হলেন ওই জাগ্রত চণ্ডীশিলার। উৎপত্তির এই কাহিনীটি হয়ত চণ্ডী সম্পর্কিত সেই চিরাচরিত ধ্যানধারণার রূপক যে, চণ্ডী হলেন অরণ্যবাসীদের লৌকিক দেবতা। □

মানিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : লেখক

আবার পুরনো লোকের কয়েকজনের পরিবর্তন ঘটেছে অস্বাভাবিক। আচার-আচরণ, জীবনযাত্রায় তাঁরা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছেন।

১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার পর সি পি আই (এম) তেনালী কনভেনশনের প্রস্তাব মত সংগঠনের জন্য ২৫ হাজার টাকা তহবিল সংগ্রহের ডাক দিয়েছিল। আজকে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম)-এর সম্পত্তি ২৫ কোটি টাকার কম নয়। সেদিন মিটিং করতে হলে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ি থেকে চেয়ার টেবিল আনতে হত। আজকে মোজাইকের মিটিং হল শুধু নয়, আসবাব পত্র অনেক বহুজাতিক শিল্প সংস্থাকে হার মানায়। সব কিছু বদলে যাচ্ছে।

একজন প্রবীণ নেতা কথায় কথায় বলছিলেন, 'তখন সারাদিন মাইলের পর মাইল হেঁটে অর্ধাহারে, অনাহারে কাটিয়ে পার্টি গড়ার কাজ করে যে আনন্দ পেতাম আজ তা পাই না। রাত্রে চ্যাটাইতে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, পার্টির জন্য কতটুকু আর করলাম! আর আজকে কত কমরেডকে দেখছি, শুধু ক্ষোভ আর ক্ষোভ। পার্টিতে এসে বাড়ি করেছে, কাজ না করেও মাসে তিন হাজার রোজগার। পার্টির হোলটাইমার হয়েও মাস গেলে সংসারে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ।

'পার্টির কমরেডদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কোথাও একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে গিয়েছে। সেটা শুধু ক্ষমতা নয়, বড় পার্টি বলেও নয়, বিপ্লবী পার্টির একটা শিক্ষা থাকে, রুচিবোধ থাকে, সঙ্গতি থাকে—বোধহয় সি পি আই (এম) সেই অভাবের তাড়নায় দরিদ্র হয়ে পড়ছে।' □



পার্টির রাজ্য সম্মেলন— দেওয়াল লেখা। ফটো : অচিন্ত্য রায়

নিশীথ দে

ফটো : সংগৃহীত

ঝিখিরার জয়চণ্ডী গড়চণ্ডী

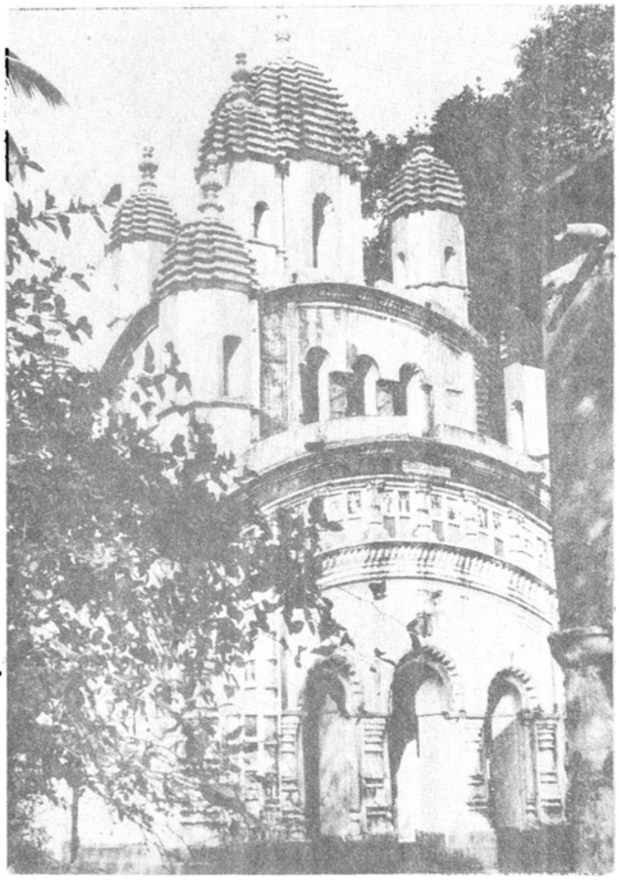
হাওড়া জেলার মানচিত্রের আকৃতির সঙ্গে ভারতের মানচিত্রের আকারের আশ্চর্য মিল। ভারতের মানচিত্রে যেখানে জয়সলমীরের সোনার কেল্লা, হাওড়া জেলার ঠিক সেই জায়গায় ঝিখিরা গ্রামের গড়। গড়ের চিহ্নও নেই, রয়েছেন অধিষ্ঠাত্রীদেবী গড়চণ্ডী, রয়েছে গড়চণ্ডী আর জয়চণ্ডীর নবরত্ন এবং আটচালা মন্দির। ঝিখিরা গ্রামটি হাওড়া-হুগলীর সীমানায়।

হাওড়া থেকে বাস-মিনিবাস আমতা হয়ে জয়পুর, অমরাগড়ি, রাউতাড়ার পাশ দিয়ে পৌঁছে যায় ঝিখিরা গ্রামে। গ্রামের পথে পথে অসংখ্য সমাধি-ফলক। মেদিনীপুরের কয়েকটি গ্রামে ছাড়া এ ব্যাপারটা অন্য কোথাও খুব বেশি দেখা যায় না। ঝিখিরা একটি আশ্চর্য জনপদ। গোটা গ্রামটিতে অনেকগুলো মন্দির, অনেক দেবদেবী একসঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় পুজিত হয়ে চলেছেন।

গড়চণ্ডী মন্দিরটির নির্মাণ হয় ইংরেজি ১৭৯৫ সালে। আগে এ মন্দির ছিল আটচালা। মন্দির-শীর্ষে লেখা : শ্রীশ্রীহরি শ্রীশ্রীশুভমস্তু শকাব্দা ১৭১৭ শক সন ১২০২ সাল। মন্দিরের দেওয়ালে সামনের দিকে সাধারণ পোড়ামাটি অলঙ্করণ, পেছনে বা ধারে কিছু নেই। মন্দিরের ভেতরে নিত্যপূজিতা দেবী গড়চণ্ডী বসে আছেন, হলুদ রঙ-করা কাঠের মূর্তি। লাল শাড়ি পরনে দেবীর পাশে মনসা ও শীতলার ঘট স্থাপিত। মন্দিরের চারপাশে নানা ধরনের গাছপালা পরিবেশটিকে ভাবময় করে তুলেছে। ছোট্ট দুটি মন্দিরের শিখর দেউলে 'বিশ্বেশ্বর' শিব ও 'শ্রীধরজীউ' শালগ্রাম রয়েছেন গড়চণ্ডীর নিত্য সঙ্গী হয়ে।

মন্দিরের সেবাইতমহাশয় জানালেন, এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দুর্বার খানের মেয়ে পদ্মাবতীর বংশধর। মন্দিরের উচ্চতা মাহেশের রথের উচ্চতার সমান।

কয়েকবছর আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল যাতে বোঝা যায় দেবী জাগ্রতা, ভক্তদের মনের বাসনা



ঝিখিরার গড়চণ্ডী মন্দির

পূরণ করেন যদি তা ন্যায্য হয়। শারদীয় পুজোর সময় খুব জাঁকজমক করে পুজো করা হয় গড়চণ্ডীর ও জয়চণ্ডীর। ষষ্ঠীর দিন মূর্তিকে নতুন শাড়ি যাঁর পরাবার কথা তিনি অবিশ্বাস করে এলেন না। পুরনো শাড়িই রইল মাতৃঅঙ্গে। অষ্টমীর দিন ভোরে শহর থেকে দৌড়ে এলেন ভদ্রলোক, সঙ্গে দুটি নতুন শাড়ি। বললেন, কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখি মা বলছেন, আমাকে শাড়ি দিবি কেন, আমি তো কাঠের পুতুল, তাই না? ভোরে উঠে চেনা দোকানির বাড়ি গিয়ে তাঁকে দিয়ে দোকান খুলিয়ে এই শাড়ি নিয়ে আসছি! মাগো, সনাতন শুভ অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম—ক্ষমা কর মা!

গড়চণ্ডীদেবীর বোনের নাম জয়চণ্ডী। বোন নন, দিদি, কারণ জয়চণ্ডীই বড়, যেহেতু তিনি ঝিখিরা গ্রামের এই সরখেল পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আগে। সামনে বিরাট একটি জলাশয়, স্থানীয়দের ভাষায় জয়পুকুর। পুকুরের তিনদিকে সবুজ বনজঙ্গল আর গ্রাম্য কুটির। এ পারে জয়চণ্ডী মন্দিরটি প্রাচীন বাংলা রীতির আটচালা। কাঠের তৈরি এই জয়চণ্ডী মূর্তি আর গড়চণ্ডী একরকম দেখতে, সহোদরা বোনেরা যেমন অনেক সময় এক রকম দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস দুবোন দিনেমানে আলাদা আলাদা থাকলেও রাত্রে থাকেন একসঙ্গে।

কী করে সম্ভব?

জাগ্রত বিশ্বাসের চেতনায় অনেক কিছুই সম্ভব হয়। বিশ্বাসীরা স্বচক্ষে দেখেছেন রাত্রে গড়চণ্ডী মায়ের মন্দির থেকে একটি জ্যোতির্ময়ী দিব্য অস্তিত্ব বেরিয়ে এসে জয়চণ্ডী মন্দিরে প্রবেশ করেন।

জয়চণ্ডী মন্দির বানিয়ে দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুর্বার খানের বংশধর। সেটা ছিল ১৬৭২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫০ খৃস্টাব্দ। এ মন্দিরের মুখ পুকুরের দিকে। সামনের দেওয়ালে কার্তিক, গণেশ, দুর্গা প্রমুখ দেবদেবী আর ফুল লতা পাতার টেরাকোটা ফলক। খুব বেশি নেই, অনেকটাই খসে পড়েছে।

জয়চণ্ডীর এখনকার মূর্তিটি অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও প্রাচীন মূর্তি ছিল পাথরের; সুস্পষ্ট আকারহীন সেই মূর্তি মাটির নিচ থেকে খুঁজে পান সেনাপতি দুর্বার খান। বনের গভীরে ছোট্ট কুটিরাশ্রমে বাস করতেন একজন যাযাবর সন্ন্যাসী। তিনিও ওই মূর্তিটি একই সময়ে একই সঙ্গে দেখতে পান। এই নিয়ে সেনাপতিতে সন্ন্যাসীতে বেজায় ঝগড়া বাধে। সেনাপতি বলেন, আমি আগে দেখেছি এই মূর্তি, সন্ন্যাসী বলেন, আমিই আগে পেয়েছি মাকে। বনবাসী আমি, এই শিলামূর্তি আগে থেকেই আমার পরিচিত।

ঝগড়ার মীমাংসা করতে তাঁরা গেলেন হুসেন শাহের দরবারে। বিপদে পড়লেন হুসেন শাহ। একদিকে তাঁর নিজের লোক, আরেকদিকে এমন এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী যাকে এড়ান যায় না।

তিনি যেন ঝগড়া থামাবার জন্যই বললেন, ঠিক আছে, যিনি আপনাদের মধ্যে জয়চণ্ডী মূর্তির আসল মালিক, এই গরম শিকটি তাঁর হাতে ফোস্কা ফেলবে না! নিন ধরুন! এই বলে একটি উত্তপ্ত লোহার শিক এগিয়ে দিলেন তিনি।

পরাজিত হলেন প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্বার খান। বনের সন্ন্যাসীই আগে পেয়েছিলেন আদিমূর্তিটি। সন্ন্যাসী একদিন বিদায় নিয়ে চলে যান। তারপর অবশ্য দুর্বার খানই মালিক হলেন ওই জাগ্রত চণ্ডীশিলার। উৎপত্তির এই কাহিনীটি হয়ত চণ্ডী সম্পর্কিত সেই চিরাচরিত ধ্যানধারণার রূপক যে, চণ্ডী হলেন অরণ্যবাসীদের লৌকিক দেবতা। □

মানিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : লেখক



আরও ফ্লেভার! আরও স্বাদ!
প্রতিদিন!
" মা, আমাকে
আরও একটু দাও!"
হাঁ! প্রতিদিন রান্নায় ম্যাগী কিউবস্ দিলে বাড়ীর সবাই আরও চাইবে। ম্যাগী কিউবস্ আপনার রান্নায় আরও ফ্লেভার, আরও স্বাদ এনে দেবে। ম্যাগী কিউবস্ দিয়ে রান্না করা খুবই সহজ।
বিনা নুনের রান্না প্রায় হয়ে এলে ম্যাগী কিউবস্ গুঁড়ো করে খাবারের ওপর ছড়িয়ে দিন। (মাথা পিছু একটি কিউব দিলেই চলবে) তারপর ভাল ভাবে নাড়ুন আর রান্না না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু আঁচে রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।
ম্যাগী কিউবস্ চিকেন এবং ভেজিটেরিয়ান প্যাকে পাওয়া যায়। একটি অথবা সাশ্রয়ী তিনটির প্যাকে পাবেন।
আজই রান্নায় ম্যাগী কিউবস্ দিয়ে দেখুন।
MAGGI
CHICKEN CUBE
MAGGI
CUBE
100% VEGETARIAN
MAGGI ®
কিউব
কেবল মাত্র বাছা বাছা শহরে পাওয়া যাচ্ছে।

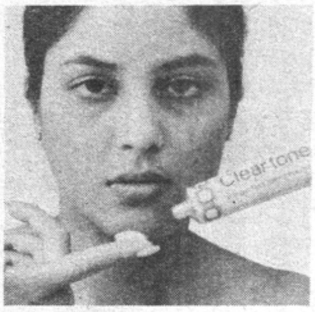
আজ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে

রঙ ফর্সা করার ক্রীম

ক্লীয়ার·টোন

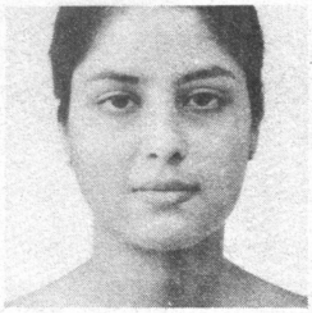
আপনাকে দেবে–এক নতুন রূপ!

১ম সপ্তাহ



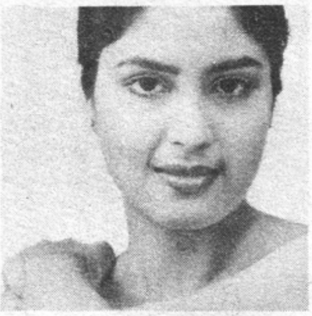
মাত্র তিন দিনেই আমার চামড়া নরম!

২য় সপ্তাহ



আমার ব্রণর দাগগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। কী আরাম!

৩য় সপ্তাহ



দেখুন! ইতিমধ্যেই আমার খরখরে কনুইও কেমন মোলায়েম!

৪র্থ সপ্তাহ



আমার বান্ধবী বললো, "তোর রঙে জৌলুষ দেখা দিয়েছে রে!"

৫ম সপ্তাহ



আশ্চর্য্য! রোদ্দুরে ঘুরেও আমি কালো হচ্ছি না!

৬ষ্ঠ সপ্তাহ



আমি এখন একজন ক্লীয়ার·টোন ক্রীম ফ্যান!

ক্লীয়ার·টোনের অদ্বিতীয় ফরমূলা মৃদু আর স্বাভাবিকভাবে আপনার ত্বক আরো উজ্জ্বল, আরো ফর্সা ক'রে তোলে। শুধু তাই নয়। **ক্লীয়ার·টোনের** এক অনন্য উপাদান ত্বকের কুৎসিৎ দাগ আর খুঁত দূর ক'রে দেয়। এর সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই আপনার রঙরূপ এমন উজ্জ্বল আর কোমল ক'রে তোলে, যা নজরে পড়ে।

নিয়মিত রোজ দুবার ক'রে **ক্লীয়ার·টোন** মাখতে থাকুন—তাহলে কি রোদে কি ঘরে, এর সুফল বজায় থাকবে চিরতরে!

উৎকৃষ্টতর ফরমূলা
উৎকৃষ্টতর ক্রিয়া



ক্লীয়ার·টোন

লণ্ডন • প্যারীস • নিউ ইয়র্ক

ফর্সা রঙের রহস্য, কাজ করে স্বাভাবিকভাবে!

daCunha/NICL/76/85 BN

ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যাণ্ড নিষিদ্ধ হোক

জামির তা চান না, কেইসিং কিন্তু চান

উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরর বিচ্ছিন্নতা-বাদী উপজাতীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী-গুলির মধ্যে 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যাণ্ড' বা এন এস সি এন যে সব চেয়ে শক্তিশালী, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। নাগা বিদ্রোহের জনক ফিজো-র মূল সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে আই-জাক স্যু আর টি মুইভা ১৯৮০-র মার্চ মাসে উত্তর বার্মার টাঙিয়া নামক স্থানে এন এস সি এন গঠন করেছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে বিরামহীনভাবে তাঁরা সশস্ত্র তৎপরতা তো চালিয়ে আসছেনই, উপরন্তু তাৎপর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক যোগাযোগও তাঁরা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এন এস সি এন সাধারণভাবে চীনপন্থী বলেই পরিচিত। কেননা, এই গোষ্ঠী চীনের কাছ থেকে বিশেষত অস্ত্র সরবরাহ ও গেরিলা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছিল। ইদানীং অবশ্য শোনা যাচ্ছে, চীন তাদের সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। অবশ্য তাতে এন এস সি এন-এর দাপট কিছু কমেনি।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রিশাং কেইসিং আজ তিন বছর ধরেই দাবি করে আসছেন, এন এস সি এন-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক না কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘোষণায় আগ্রহী নয়। ত্রিপুরায় টি এন ভি-কেও নিষিদ্ধ করা হয়নি। সেখানেও ত্রিপুরা সরকারেরই আপত্তি। তাঁরা উগ্র-পন্থী সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে চান। মণিপুরের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। সেখানে পিপলস লিবারেশন আর্মি (পি এল এ) সহ ছোট বড় সবকটি উগ্রপন্থী সংগঠনই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, কেবল এন এস সি এন এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরার রাজ্যপাল কৃষ্ণ রাও সম্প্রতি আগর-তলায় এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। নাগাল্যাণ্ড সরকার, বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রী এস সি জামির এন এস সি এন-কে নিষিদ্ধ করার বিরোধী বলেই যে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, সেই কথা রাজ্য-পাল সরকারিভাবে স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণ রাও অবশ্য জানান যে, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রিশাং কেই-সিং এন এস সি এন-কে নিষিদ্ধ করার জন্য সমানে দাবি করছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জামির এন এস সি এন-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং তাঁরাও শিগগিরই শান্তি আলোচনায় বসবেন এরকম একটি সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে বলে জামির মনে করেন, আর এ জন্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে এগোতে চাইছে।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রিশাং কেইসিং এবং নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এস সি জামির একই দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এন এস সি এন সম্পর্কে তাঁরা যে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টি-ভঙ্গী পোষণ করেন, সে কথা কেউই গোপন রাখেননি। আবার এন এস সি এন-ও জামিরকে মিত্র-ভাবাপন্ন বলে মনে করে থাকে। সেজন্যে জামির ও কংগ্রেস (ই) নাগাল্যাণ্ডের নির্বাচনে এন এস সি এন-এর সমর্থন পেয়েছিল এবং জামির ক্ষমতাসীন হবার পরই নাগাল্যাণ্ডে এন এস সি এন-এর হামলা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

বস্তুত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপ-জাতীয় বিদ্রোহী অধ্যুষিত অঞ্চল-গুলির নেতাদের মধ্যে মাত্র দুজন উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পর্যায়ে সক্ষম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এ'দের এক-জন হচ্ছেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়র ও মিজোরামের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী টি সাইলো, অপরজন মণিপুরের মুখ্য-মন্ত্রী রিশাং কেইসিং। রিশাং নিজে উখরুল জেলার টাঙখুল নাগা গোষ্ঠীর লোক, যে গোষ্ঠী থেকেই বহু-সংখ্যক যুবক এন এস সি এন-এ যোগ দিয়েছেন। এন এস সি এন-এর সর্বাধিনায়ক টি মুইভা উখরুলেরই টাঙখুল নাগা। রিশাং এই উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে 'রক্ষী বাহিনী' গড়ে তুলেই প্রথম পাদ-প্রদীপের আলোকে এসেছিলেন। সেই থেকেই এন এস সি এন তাঁকে পয়লা নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে।

নাগাল্যাণ্ডের রাজনীতিতে মুখ্য-মন্ত্রী এস সি জামিরের অবস্থান একটু ভিন্ন ধরনের। জামির নিজে আও নাগা এবং সেই হিসাবে আঙামি-নিয়ন্ত্রণাধীন ইউ ডি এফ-এ (বর্তমান নাম এন এন ডি পি) থাকাকালীন তাঁর পক্ষে নেতৃত্বে আসা সম্ভব হয়নি। নাগা বিদ্রোহীরা দ্বিধাবিভক্ত হবার পর ফিজোর সমর্থকরা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ফিজোর 'ফেডারেল গভর্নমেন্ট অব নাগাল্যাণ্ড' মুখ্যত আত্মগোপনকারী আঙামিদের সং-গঠন হয়ে পড়ে। উপজাতীয় একাত্মতাবোধ নাগাল্যাণ্ডে অতিমাত্রায় প্রবল এবং সেই জনাই নাগাল্যাণ্ডের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জাসোকি ও তাঁর দল এন এন ডি পি ফিজোপন্থীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করত। ফিজোর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে আত্ম-গোপনকারী উগ্রপন্থীদের যে অংশ আইজাক স্যু—মুইভা'র নেতৃত্বে এন এস সি এন গঠন করল, তারা প্রকাশ্যেই সর্বস্তরে আঙামি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। নাগাল্যাণ্ডে বিগত নির্বাচনের সময় দেখেছি, ঐখানে এন এন ডি পি-র সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াইটা বহুলাংশে ফিজোপন্থীদের সঙ্গে মুইভা-র এন এস সি এন-এর শক্তি পরীক্ষায় পরিণত হয়েছিল।

কংগ্রেসের নির্বাচনী অভি-যানের নায়ক এস সি জামিরের বাহাদুরি হচ্ছে, অ-আঙামি উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে মোটা-মুটিভাবে একই মঞ্চে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এন এস সি এন-এর সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন তা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। নাগাল্যাণ্ডে জামির তথা কংগ্রেস (ই)-র রাজ-নৈতিক স্থায়িত্ব এখনও অনেকটাই এন এস সি এন-এর সমর্থনের উপর নির্ভরশীল এবং সেজন্যই এন এস সি এন-এর সঙ্গে সম-ঝোতা বজায় রেখে চলাই উচিত বলে মনে করা হচ্ছে। মণিপুরে রিশাং কেইসিং-এর সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই এন এস সি এন-কে নিষিদ্ধ করার জন্যে রিশাং সমানে দাবি করে চলেছেন।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, এস সি জামির এন এস সি এন-কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসানর জন্য মাঝে মধ্যেই তাঁদের বার্মা সদর দপ্তরে দূত পাঠিয়ে থাকেন। জামির দাবি করেন যে, এন এস সি এন সদর দপ্তরে আলোচনার অনুকূল পরিবেশ ইতিমধ্যে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যত ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গে সংযুক্ত লোকরাই এ ব্যাপারে দৌত্য করেছেন।

স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কর্ম-কর্তারা মুইভার সদর দপ্তর থেকে কেবল 'সার্বভৌম নাগারাষ্ট্রের' ইস্তাহার নিয়েই ফিরে আসেননি, ঐখানে ও'দের মগজ ধোলাইও যে হয়েছিল, আসাম পুলিশের হাতে তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। আর একদল শান্তি দূত এন এস সি এন-এর কাছ থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়াঙমাসো সাইজার মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে এসেছিলেন। রিশাং কেইসিং সেজন্যেই বিশ্বাস করেন না যে, এন এস সি এন সত্যিই শান্তি আলোচনায় আগ্রহী। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক না কেন, দিল্লিতে তাঁর কথা বিকোয়নি। দিল্লি এ-ক্ষেত্রে জামিরের মতকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

মণিপুরের যে ৭৭ জনের নামে এন এস সি এন-এর মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাইজা সহ ১৯ জন ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছেন। □

রবিজিৎ চৌধুরী


neem
HERBAL TOOTHPASTE
New foaming freshness!
CALCHEMICO
নিম টুথপেস্ট
শক্ত দাঁত ও সুস্থসবল মাড়ির জন্যে
একটি প্রাকৃতিক উপায়
শত শত বৎসর ধরে নিমের দাঁতনই ছিল দাঁতের যত্নের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক উপায়। এতে দাঁত শক্ত হত ও মাড়ি থাকত সুস্থসবল।
৬২ বছর আগে, ক্যালকাটা কেমিক্যাল নিমের প্রাকৃতিক গুণটুকু নিয়ে তৈরি করেছে একটি টুথপেস্ট···নিম—ভারতের প্রথম ভেষজ গুণেভরা টুথপেস্ট।
আর এখন, নতুন নিম টুথপেস্টে আছে বাড়তি ফেনা···এর ফলে নিমের ভেষজ ও তেলের জীবাণুনাশী শক্তি আরো সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এতে একটি নতুন সুবাস থাকার ফলে মুখে একটি তরতাজা অপূর্ব স্বাদ অনুভব করা যায়।
নিম
পৃথিবীর প্রথম ভেষজ টুথপেস্ট। ভারতে এর জন্ম ৬০ বছর আগে

ডেটলাইন ঃ ঢাকা

'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে
মঙ্গল আলোক
তবে তাই হোক'—

বাংলাদেশের প্রায় দু কোটি হিন্দু জনসমষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গাপুজো হয়ে গেল এমনই এক দুঃখের তিমিরে। বাংলাদেশের চোদ্দ বছরের জীবনে এখন বেদনাবিধুর পরিবেশে কখনই এই সর্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়টাতে যখন সারা দেশ জুড়ে দুর্গাপুজোর সাড়ম্বর প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক সে সময়েই ঘটল জাতীয় জীবনের অন্যতম সকরুণ দুর্ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল-এর টিভি কক্ষের ছাদ ধসে সৃষ্টি করল সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে করুণ কাহিনী। ১৫ অক্টোবরের জগন্নাথ হল ট্যাজেডিতে ঘটনাস্থলেই ছাদ চাপা পড়ে মারা গেল ৩৪ জন তাজা ছাত্র। আহত হয়ে পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল আরও তিনজন। 'ঢাকা শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে শতাধিক। হয়ত বা আরও ঝরবে বেশ কটি প্রাণ।

জগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৃহৎ আবাসিক ছাত্রাবাস। এ হল-এ চোদ্দশোর মত মত হিন্দু ছাত্র বসবাস করে। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময়টাতে হল প্রাঙ্গণে তৈরি হয় বৃহৎ পুজো মণ্ডপ। এবারেও তৈরি হচ্ছিল মণ্ডপ। পুজোর বাতাস লেগেছিল জগন্নাথ হলের প্রতিটি কামরায়। আর ঠিক এমনই একটা আনন্দঘন পরিবেশে নেমে এল বিষাদের অভিশাপ।

ষাট বছরের পুরনো জিরজিরে দালানখানি সন্ধ্যারাতে ধসে পড়ল। কয়েকশো ছাত্রের মাথার ওপর। স্টিলের বিশাল ছাদ কাঠামোটির চাপে পিষে মারা গেল অসংখ্য প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ। পাল্টে গেল আনন্দের বাতাস এক মুহূর্তে। কান্না আর আর্তনাদের স্বরে ভরে উঠল 'অর্ধ শতাব্দীর অধিক পুরনো রমনা এলাকার জগন্নাথ হল। মুহূর্তে ঢাকা শহরের চঞ্চল জনজীবন ভেঙে পড়ল ভাই স্বজন হারানর ব্যথায়।



গভীর শোকের মধ্যে এবার দুর্গাপুজো হল



নিহত ছাত্রের সারি; ফটো : মুক্তি মুনির

ঢাকা শহরের সাতটি হাসপাতালের কয়েক ডজন অ্যাম্বুলেন্স সারারাত ধরে করুণ শব্দ তুলে রক্তাক্ত দেহগুলো নিয়ে ছুটল হাসপাতালে। রেডিও-টেলিভিশনে মর্মন্তুদ এই দুর্ঘটনার খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সারা শহর ছুটল জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে। এল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি হল-এর সব ছাত্ররা। শহরের প্রতিটি এলাকার নারী-পুরুষ। রোকেয়া হল আর সামসুন্নাহার হল-এর মেয়েরা চোখের জল ফেলে ভিড় করল জগন্নাথ হল-এর ধ্বংসস্তূপের সামনে, হাসপাতালের করিডোরে। রক্ত দিতে ছুটল হাজারো তরুণ ব্লাড ব্যাঙ্কে।

১৫ অক্টোবর রাত পৌনে নটায় ঘটল দুর্ঘটনা। সে রাত, পরদিন, তার পরদিন এবং রাত— হাজারো শোকার্ত মানুষের ভিড়ে ভরে থাকল জগন্নাথ হল। অপঘাতে স্বজন হারানর ব্যথা একটি বিরাট জনসমষ্টিকে কতখানি মুষড়ে দিতে পারে ১৫ থেকে ২০ অক্টোবর শহরকে না দেখলে তা বোঝা যেত না কিছুতেই। একদিকে ছাত্র-জনতা, সামরিক বাহিনী, পুলিশ ধ্বংসস্তূপের মাঝ থেকে সারারাত ধরে খুঁজে বের করছে হতভাগ্য লাশ, অন্যদিকে হাসপাতালগুলোর প্রতিটি খোলা জায়গা ভরে উঠছে অগণিত ছাত্রের রক্তাক্ত শরীরে। এ দুর্ঘটনার সর্বমোট শিকার প্রায় তিনশো ছাত্র। নিহত-আহতদের প্রায় প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত বাবা-মা-র কষ্টার্জিত উপার্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে উঠে এসেছে সমগ্র পরিবারের আশার আলোক বর্তিকা হয়ে। কিন্তু হায়, এ কোন পরিণতি! দেশের সরকার নিহত প্রতিটি ছাত্রের পরিবারের জন্যে এক লক্ষ টাকা করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এ ক্ষতিপূরণের প্রত্যাশা কেউ কি কখনো করেছিল? বাংলাদেশে তিনদিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছে, নিহত ছাত্রদের কফিন হেলিকপ্টারে করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে গ্রামের বাড়ি বাড়ি। মুখ্য সামরিক প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদ স্বয়ং বাহামা এবং নিউ ইয়র্কের সফর ৭ দিন কমিয়ে দ্রুত চলে এসেছেন স্বদেশের

মাটিতে সমবেদনা জানাতে—তবু কি সদুত্তর মিলেছে এই প্রশ্নের ঃ কেন দীর্ঘকাল যাবৎ জগন্নাথ হল-এর মত একটি ঐতিহ্যবাহী হল-এর মেরামতি কাজ হয়নি এতটুকু, কেন হল প্রশাসন বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সচেতন হননি এতকাল ?

দুঃখের তিমিরে পুজো

কোন বাধাই বোধ করি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে পারে না কাউকে দীর্ঘকাল। সময়ের নিয়মেই এগিয়ে যেতে হয় মানুষকে, গ্রহণ করে নিতে হয় কঠোর বর্তমানকে। এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের শুরুতে দুঃখের যে ঘন বাতাস বয়ে গেছে সারা দেশে তা সমগ্র দেশবাসীকে মুষড়ে দিয়েছে। বেশি শোকাহত করেছে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে।

তবু, ঘটা করে না হলেও হয়েছে দুর্গাপুজো। একমাত্র ঢাকা শহরেই পুজোর মণ্ডপ হয়েছে ৯৩টি। চট্টগ্রামে ৮০টি। প্রতিবারের মত ঘটা করে আনন্দোৎসব হয়নি এবার। জাতীয় সর্বজনীন পুজো কমিটির আহ্বানে সারা দেশের পুজো মণ্ডপগুলোতে হৈ হুল্লোড়-আনন্দোৎসব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শোকের চিহ্ন কালো ব্যাজ পরেছিলেন নগর-গ্রাম-বন্দরের পুজো উদযাপন কর্মীরা। প্রতিটি পুজো মণ্ডপে টাঙান হয়েছিল কালো পতাকা। প্রতি বছর শারদীয় দুর্গাপুজোয় যে আনন্দোৎসব হয়, তা এবার হয়নি। আনন্দের বদলে হয়েছে শোক মিছিল। বিজয়া দশমীর দিনে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের নগরে বন্দরে বেরিয়েছে বিশাল বিরাট শোভাযাত্রা।

পুজোর নবমী তিথিতে জগন্নাথ হল-এর নিহতদের স্মরণে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুজো-অঙ্গনে মহানগর সর্বজনীন পুজো কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় বক্তব্য রেখেছেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল, সাহিত্যিক আবু জাফর সামসুদ্দিন, রাজনৈতিক নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেখর হালদার, ব্যারিস্টার সুধীন দাস, রেভারেণ্ড পুল গোমেজ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বিচারপতি কামাল-উদ্দিন চৌধুরী, আইনজীবী সৈয়দ ইসতিয়াক আহমদ সহ ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

স্মরণকালের এই বৃহত্তম শোকসভায় বক্তাগণ জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী করেছেন 'কর্তৃপক্ষ'কে। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, 'ষাটের দশকে জগন্নাথ হল সংস্কারের দাবি উঠেছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ তাই কোনভাবেই দুর্ঘটনার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।' বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবু জাফর সামসুদ্দিন বলেন, 'এটা একটা ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স।' সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে চারপাশে খুশির বন্যা বইছে, রাশি রাশি টাকা দেদার খরচ হচ্ছে, অথচ জগন্নাথ হল-এর মত জরাজীর্ণ ছাত্রাবাস ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই।' প্রাক্তন স্পিকার মীর্জা গোলাম হাফিজ বলেন—'জগন্নাথ হল-এর ছাদ দিয়ে ১৯৫৭ সাল থেকেই পানি পড়ত, এবং তখন থেকেই এটাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, অথচ আজ পর্যন্ত এটার সংস্কার না হওয়ায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল।'

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে প্রবীণা কবি বেগম সুফিয়া কামাল বলেন—'আজ পুজোর দিনে শোকসভা করতে হচ্ছে, এর চেয়ে বেদনার আর কী হতে পারে।' সভায় সভাপতি সি আর দত্ত বলেন, 'রাজধানীতে আজ জাঁকজমকের কমতি নেই, লাখ লাখ টাকা খরচ করে সুপার মার্কেট বানান হচ্ছে, স্থানে স্থানে রঙিন ফোয়ারা তৈরি হচ্ছে, সুইমিং পুলের পেছনেও কম টাকা খরচ হচ্ছে না—অথচ দেশের ভবিষৎ যে ছাত্রসমাজ তাদের থাকবার জায়গারও কোন নিরাপত্তা নেই।'

মোট কথা, এবারের ঢাকা নগরী-সহ প্রায় সারা দেশের পুজোর আনুষ্ঠানিকতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল ১৫ অক্টোবরের জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার আহত নিহতের প্রতি ভালবাসায়। বাংলাদেশে মোট কতগুলি পুজোর মণ্ডপ হয়েছিল এবার তার সঠিক সংখ্যা জানা দুষ্কর। ঢাকা মহানগর সর্বজনীন পুজো কমিটিই মূলত প্রতি-বছর জাতীয় পুজো উদযাপন কমিটির দায়িত্ব পালন করে আসছে। এবারের ১ কার্তিক, শারদীয় দুর্গোৎসব শুরুর আগের দিন, সারা দেশের পুজো কমিটির প্রতিনিধিগণ ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অঙ্গনে পুজো উদযাপনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্যে এক সভা ডেকেছিলেন। এই সভায়, মূলত দেশের শহরাঞ্চল থেকে তিনশো কমিটির প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তবে, মহানগর পুজো কমিটির কর্মকর্তা স্বপন সাহার মতে, সারা দেশে গত বছর ৪ হাজারের ওপর পুজো মণ্ডপ হয়েছিল। এবারে সে সংখ্যা বাড়বে বৈ কমবে না বলে তিনি মনে করেন।

বিজয়া দশমীতে ঢাকা শহরের হাসপাতালগুলোতে সৃষ্টি হয়েছিল অভূতপূর্ব কান্নার রোল। ঢাকা শহর এবং শহরতলির প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকে হাজার হাজার নর-নারী পুজোর প্রসাদ হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন হাসপাতালে শতাধিক আহত ভাইদের নিবেদন করতে।

অভূতপূর্ব সহানুভূতি

শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা বাংলাদেশটাই শোকাচ্ছন্ন হয়েছিল জগন্নাথ হল-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। রাজধানীর রাজপথগুলো যেমন ভরে উঠেছিল হাজারো শোকার্ত মানুষের ভিড়ে তেমনি জাতীয় সংবাদপত্রের পাতাগুলো ভর্তি হয়ে উঠেছিল হাজারো শোকবাণীতে। একটা কথা বলা বোধ করি অনুচিত হবে না, ১৯৭১ সালের পর থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে যে অসাম্প্রদায়িকতার অমর বৃক্ষ-বীজ রোপিত হয়েছিল, এবারের জগন্নাথ হল-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

১৫ অক্টোবরের পর থেকে প্রতিদিন রাতে জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনা স্থান আর নগরীর হাসপাতালগুলো হয়ে ওঠেছিল লাখো মানুষের তীর্থস্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে বিশাল মৌন-শোক মিছিল হয়েছে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কে। দেশের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট মৌন মিছিল করেছে। এরশাদ মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্য, দেশের প্রতিটি উচ্চ-পর্যায়ের সামরিক এবং অসামরিক নেতৃবৃন্দ ঘুরে গেছেন জগন্নাথ হল। শোকবাণীতে ভরে গেছে পত্রিকার পাতা।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বাহামা থেকে শোকবাণী পাঠিয়েছেন। সময় ৭ দিন কমিয়ে জিয়া বিমান বন্দরে নেমে সোজা তিনি চলে যান



এয়োতিদের সিঁদুরদান ঃ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে / স্বপনকুমার সাহা

হাসপাতালে। শহরের প্রতিটি হাসপাতাল তিনি সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে আহত ছাত্রদের দেখেন। বলেন—'তোমাদের জন্য সব কিছু করা হবে। তোমরা মুষড়ে পড়ো না।' এবারের দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রথমবারের মত বাণী প্রদান করেছেন রাষ্ট্রপতি। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনি দেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন—'সব ধর্ম অনুসারীদের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন আমাদের মধ্যে যে জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তুলেছে, আগামীতে তা আরও সুদৃঢ় হবে।' উল্লেখ করা যেতে পারে, পুজো উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণীর দাবি হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরনো। শুধু একাদনই নয়, রাষ্ট্রপতি বারংবার দেখে গেছেন আহত ছাত্রদের। চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসকদের সচেতন হতে বলেছেন। তবে, আমার এ রিপোর্ট লেখার দিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনার স্থান ঘুরে যাননি। তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সংস্কারের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।



জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনার শোক মিছিল / ফটো : মুক্তি মুনির

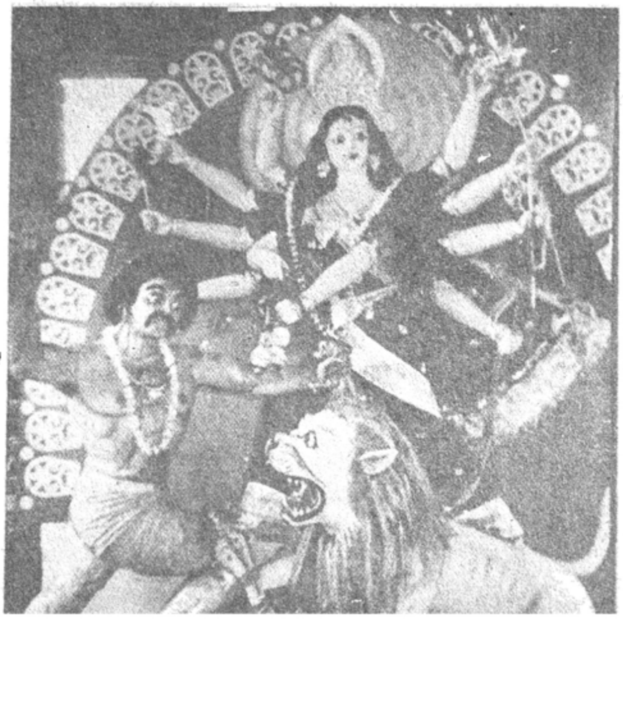
এবারে এরশাদ মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী সফর করেছেন রাজধানীর বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ। টাঙ্গাইলের এক পুজো মণ্ডপ সফরের সময় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রী মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট এরশাদের সুষ্ঠু ন্যায়-নীতির ফলেই বাংলাদেশে উত্তম সামাজিক সৌহার্দ্য বিরাজ করছে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্য গড়ে উঠেছে।

লাশ নিয়ে রাজনীতি

জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনার পর থেকে দেশের সব কটি বিরোধী দল সম্মিলিত ভাবে দেশের সামরিক সরকারকে কঠোরতম ভাষায় আক্রমণ করে গেছে। সরকারের গঠন করা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের বাইরে ১৫ দলীয় ঐক্য জোট গঠন করেছে গণতদন্ত কমিশন। ১৫ দলের গণতদন্ত কমিশন নিয়ে বেশ কিছু সরকারি নেতা এবং মন্ত্রী (এঁদের অধিকাংশই বিরোধী দল থেকে কিছুদিন হল মন্ত্রী হয়েছেন) বিরোধী শিবিরকে আক্রমণ করেছেন।

যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মতে, ১৫ দলের গণতদন্ত কমিশনে যে ৪জন প্রাক্তন বিচারপতি রয়েছেন তাঁরা এই কমিশনে নিজেদের সম্পৃক্ত করে বিচার বিভাগের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। মওদুদ খোদ ১৫ দলকেও এই কমিশন গঠন করার জন্যে দোষারোপ করেন। মওদুদের এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামালুদ্দিন হোসেনসহ একাধিক আইনজ্ঞ এমনকী সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতি পর্যন্ত মওদুদকে পাল্টা আক্রমণ করে বসেন। তাঁরা বলেন, গণতদন্ত কমিশন কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নয় আর এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখার কোন অধিকারই মওদুদের নেই, কারণ মাত্র ১ বছর আগে মওদুদ নিজেই বিরোধী দলে থাকাকালীন এমনই এক গণতদন্ত কমিশন-এর সদস্য ছিলেন।

১৫ দল এবং ৭ দলের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। আলাদাভাবে এই দুই বিরোধী শিবির জগন্নাথ হল-এর নিহতদের স্মরণে শোক-দিবস পালন করে। হাসিনা বলেন, 'পুজোর আগে যেসব বাবা মা আশায় ছিলেন তাঁদের ছেলেরা বাড়ি ফিরবে, আজ সেই সন্তানের লাশ দেখার যে অনুভূতি তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই।...আমাদের ছাত্র তরুণরা ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে পুলিশ-মিলিটারির হাতে নির্যাতিত হয়, গুলি খায়, পুলিশের ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়, আবার ছাত্রাবাসেও যদি কর্তৃপক্ষের অবহেলায় তাদের প্রাণ দিতে হয় তাহলে এ দুঃখ আমরা রাখব কোথায়?' শেখ হাসিনা আরও বলেন, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে টাকার অভাব। কিন্তু ক্ষমতা দখল করে দল গঠন করার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করতে বা লাঠিয়াল বাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে টাকার অভাব হয় না।



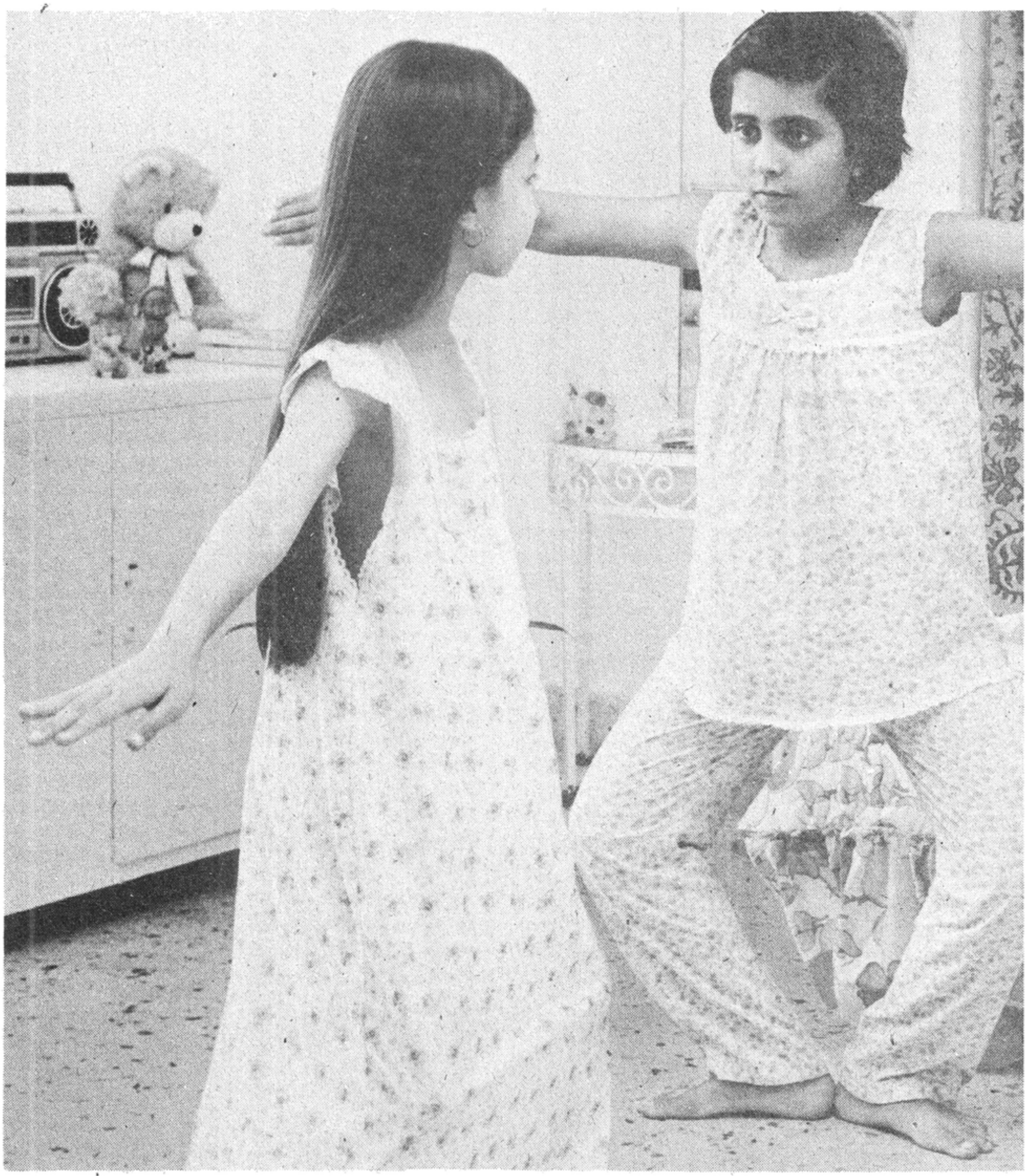
ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিমা/ফটো : স্বপনকুমার

অন্যদিকে খালেদা জিয়া বলেছেন, এই সরকার দেশের মানুষকে ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি শোকের ভাষাকে প্রতিবাদের ভাষাতে রূপান্তরিত করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান।

অন্য দিকে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্যে হল কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কেউই এ-যাবৎ তাঁদের দায়িত্বের কথা স্বীকার করেননি। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলেছে, দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ-সরকারের আমলে অবহেলিত, কারণ সামরিক খাতসহ শুধুমাত্র অনুৎপাদক খাতেই জাতীয় বাজেটের সিংহ ভাগ ব্যয় করে আসছেন তাঁরা। অবিলম্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষাখাতে বাজেট বাড়াবার দাবি করেছেন।

জগন্নাথ হল-এর দুর্ঘটনা নিয়ে দেশের সম্মিলিত বিরোধী ঐক্যজোট যখন প্রবল ভাবে সরকারি নীতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন, ঠিক সেই সময়েই সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে এই বলে যে, বিরোধী দল লাশ নিয়ে রাজনীতি করছে। □

ঢাকা থেকে
হারুন হাবীব



তোমার এ সুন্দর সাজ
এক সময় ছিল শুধু
এক টুকরো কাপড়!

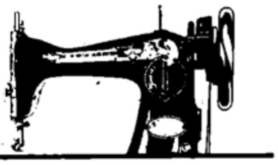


মনে আছে– সেই কত রাত জাগা…কত কষ্টকর দিনগুলো ?
তবু তোমার কী ভালই না লাগতো !
আর, তোমার জন্যে মা যে 'নাইটি' বানিয়েছিলেন তা প'রে তুমি কত হাল্কা আর আরামবোধ করতে—মনে আছে তো ? তারপর, তুমি নিজের জামা নিজেই বানাতে শুরু করলে—মা যেমনটি শেখালেন।

তাবলে কি ঠিক মায়ের মত তেমন সেলাই করতে পারতে—তোমার যে তখন সবে হাতেখড়ি !
তারপর যখন হাত পাকলো—তোমার মেরিট দিয়ে রোজই তুমি কিছু না কিছু সেলাই ক'রে কী আনন্দই না পেতে।
ছোট-ছোট, বড়-বড় জামা বা পোশাক—যেমনটি চাইতে, মেরিট থেকে পেতে !
নিজের হাতে মনোরম সূক্ষ্ম সেলাই… এখানে একটু কোঁচকানো…ওখানে প্লিট… ঐ সব সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে তুমি যখন স্কুলে যেতে, অন্য মেয়েদের কেমন চোখ টাটাতো—মনে পড়ে ?

আর, তাদের মায়েরা অবাক হ'য়ে ভাবতেন—"সবসময় তোমাকে এত স্মার্ট দেখায় কি করে ?"

হ্যাঁ! এটা তোমার মেরিট দিয়ে তোমারই কেরামতি!



সিঙ্গার ®
মেরিট*

বেশির ভাগ লোকই জানে- সবচেয়ে সেরা সেলাই মানেই মেরিট মেশিন!

ইন্ডিয়ান সিউইং মেশিন কোম্পানী লিঃ
* সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক

SPEER 689 85 BEN



বাংলা-দেশের ডায়রি

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মহাসপ্তমীর দিন বিকেল। হরিদাসপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তখনও হাজার-খানেক লোক বসে। সারা দিনে তিন হাজার লোক ভারত থেকে বাংলাদেশে গেছেন পুজোর ছুটিতে।

আমাকে বাংলাদেশের বর্ডার ও সি মান্নান সাহেব বললেন, এ বছর বেশির ভাগ লোক আসছেন ভারত থেকে। এপার থেকে দিনে ওপারে যাওয়ার সংখ্যা এক হাজার। আমি জানতে চেয়েছিলাম, দিনে তিন হাজার করে ভারতীয় যাত্রী ঢুকছেন এই পুজোর কদিনে। আমার মত কেউ আছেন কি, যিনি শুধু নিছকই পুজোর ছুটিতে সপরিবারে বেড়াতে যাচ্ছেন বাংলাদেশে ?

মান্নান সাহেব জবাব দিয়েছিলেন—জী না, এমন যাত্রী আপনি একাই।

ভ্রমণপাগল বাঙালি বোধহয় এখনও জানেন না ঘরের পাশে এত অল্প খরচায় একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু দেখে আসা যায়। কলকাতা থেকে বনগাঁর ট্রেনভাড়া মাত্র ছ টাকা। স্টেশন থেকে মতিগঞ্জ, মতিগঞ্জ থেকে বর্ডার রিকশায় মাথা পিছু আর পাঁচ টাকা করে। ওপারে বেনাপোল বাজার পর্যন্ত রিকশায় যান—ভারতীয় মুদ্রায় টাকা দুয়েক।

সেখান থেকে আরামপ্রদ মিনিবাসে যশোর ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র পাঁচ টাকা। খুলনায় গেলে আরও পাঁচ টাকা। মাথা পিছু কুড়ি টাকায় হোটেল পাবেন যশোর খুলনায়। খুলনা থেকে বরিশাল যেতে পারেন স্টিমারে। যশোর থেকে সারা বাংলাদেশেই ঘোরা যায় বাসে করে।

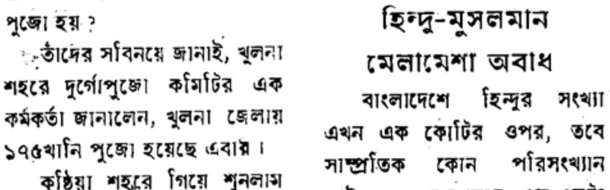
বাংলাদেশে দুর্গাপুজো

আমরা মুখ্যত গিয়েছিলাম বাংলাদেশে পুজো দেখতে। আমরা অর্থে আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা। অনেকেই আমার প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে কী মশাই, পুজো দেখতে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ? কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিলেন বাংলাদেশে কি পুজো হয় ?

তাঁদের সবিনয়ে জানাই, খুলনা শহরে দুর্গোপুজো কমিটির এক কর্মকর্তা জানালেন, খুলনা জেলায় ১৭৫খানি পুজো হয়েছে এবার।

কুষ্টিয়া শহরে গিয়ে শুনলাম আশেপাশে মিলিয়ে ১৯খানি পুজো। যশোরে তিনটি বড় পুজো মণ্ডপে আমি গিয়েছি। ঢাকার খবর তো হারুণ হাবিব আলাদা করে লিখছেন।

তবে ঢাকা জগন্নাথ হলের ঘটনার জন্য এবার পুজোয় আলোকসজ্জা ও মাইক বন্ধ ছিল। তাও দেখলাম গ্রামের দিকে মাইক বাজছে। বাংলাদেশে মাইকে বাংলাদেশি শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার শিল্পীদের গানও বাজে। কাজেই বোঝার উপায় নেই কোথায় আছি—নদীয়ার গ্রামে, না খুলনার গ্রামে। সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিনই দেখলাম হাইওয়ে ধরে হিন্দু মহিলারা চলেছেন সাইকেল ভ্যানে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পুজো মণ্ডপে। যশোর জেলার কেশবপুর গ্রামে দেখলাম বাজারের ওপর পুজোর মেলা বসেছে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে আরতি হচ্ছে। সাগরদাঁড়িতে মাইকেলের ভিটেতে রাজনারায়ণ দত্তর চণ্ডীমণ্ডপে পুজো দেখলাম।



লালন ফকিরের স্মৃতিসৌধ : কুষ্টিয়া

হিন্দু-মুসলমান মেলামেশা অবাধ

বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা এখন এক কোটির ওপর, তবে সাম্প্রতিক কোন পরিসংখ্যান নেই। খুলনা জেলার এক একটা গ্রাম আছে যেখানে এখনও হিন্দুরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। আমাকে মুসলমানদের অনেকেই বললেন : সব জেলাতেই ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী আছেন। তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট। যশোরে বিমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হল। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। দীর্ঘকাল ধরে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান।

যশোরে ঘোষেদের বাড়ির বিখ্যাত পুজো দেখতে গিয়েছিলাম। খুব ভাল অবস্থা। কাঠের ব্যবসা। পুজো উপলক্ষে ভারত থেকে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই এপার বাংলায় আত্মীয়-স্বজনদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তানি আমলে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরা অনেক নির্যাতন ভোগ করেছেন। ভারতের সঙ্গে কিছু একটা গণ্ডগোল হলেই বেছে বেছে কিছু হিন্দুকে গ্রেফতার করা হত। বাংলাদেশ হবার পর আর সে প্রশ্ন ওঠে না। আমাকে একাধিক বাংলাদেশি হিন্দু বলেছেন, বাংলাদেশ হবার পর সাম্প্রদায়িকতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিতর্কমূলক শত্রু সম্পত্তি আইন—পরে যার নাম হয়েছিল অর্পিত সম্পত্তি আইন, সম্প্রতি সরকার সে আইনের প্রয়োগ বন্ধ রেখেছেন। এর ফলে সংখ্যালঘুরা অত্যন্ত খুশি। বাংলাদেশে আর একটি জিনিস চোখে পড়ার মত। সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মেলামেশা অবাধ। এটা পশ্চিমবঙ্গে নেই। ইসলামিক সংস্কৃতির প্রভাব হিন্দুদের জীবনচর্য্যার মধ্যে পড়েছে। তাঁরাও কথায় কথায় পানি, জী, নাস্তা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। ধুতি পরা হিন্দু চোখেই পড়ে না।

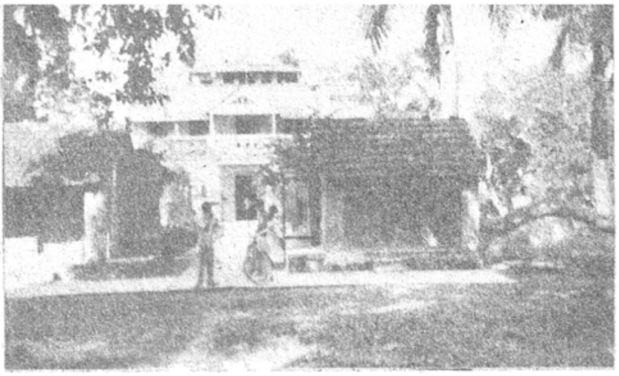
আমি পুজো মণ্ডপে লুঙ্গি পরা বহু স্বেচ্ছাসেবক অথবা প্রতিমা দর্শনার্থী দেখেছি। অবশ্য হিন্দু মহিলারা শাঁখা সিঁদুর ব্যবহার করছেন। মুসলিম মেয়েরা টিপ পরছেন। স্কুলের মেয়েদের পোশাক শালোয়ার কামিজ ও পাজামা। বয়স্কা মেয়েরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শাড়ি পরছেন।

ভারত-বিরোধিতার উৎস

আগের তুলনায় বাংলাদেশে ভারত-বিরোধীতা এখন বহুলাংশে

কম এসেছে। রাজীব গান্ধী বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়। বিশেষ করে ঘূর্ণি ঝড়ের সময় তিনি হঠাৎ যেভাবে বাংলাদেশে এসেছিলেন তাতে তাঁর ইমেজ অনেক বেড়ে গেছে। আমি অনেক সরকারি অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁরা ভারতের অগ্রগতির বেশ প্রশংসাই করলেন। তবে ভারত-বিরোধিতার ব্যাপারটা অনেকের মধ্যে চাপা থাকে। আগে যেমন কথায় কথায় প্রকাশ পেত, এখন সেটা অনেক কথা বলার পর প্রকাশ পায়। যশোরে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কিছু স্থানীয় সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন। একজন সাংবাদিক বললেন: পাকিস্তানি ক্রিকেট টিমকে ঢাকার মেয়েরা নাকি চুমু খেয়েছে। অথচ ভারত যখন খেলতে এল তখন কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি।

এর কারণ ভারতকেই অনুসন্ধান করতে হবে। একজন আলাদাভাবে কথা বলার সময় বললেন: আমরা তো ভারতের কলোনি হয়ে রয়েছি। ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। তার মধ্যে একটি হল কুষ্টিয়ার


রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি : শিলাইদহ

কাছে ভারতীয় এলাকায় ভারত নাকি মিনি ফরাক্কা করে বাংলাদেশের নদীগুলিকে শুকিয়ে দিচ্ছে।

ভারতীয় দূতাবাস বাংলাদেশিদের ভিসা দেবার ব্যাপারে হয়রানি করছে। স্পনসরশিপ জাল এই অছিলায় স্পনসরশিপ সার্টিফিকেট বাতিল করে প্রকারান্তরে ডলার নিয়ে ভারতে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ একটি ডলারের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ১২ টাকা। বাংলাদেশে ডলারের দাম ৩২ টাকা। এর ফলে গরিব মানুষরা ভারতে যেতে প্যরছেন না। ভিসার এই কড়াকড়ির ফলে সীমান্ত দিয়ে বেআইনি যাতায়াত বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ দুর্মূল্য ডলার দিয়ে বিদেশ থেকে যা কেনে তা ভারতে পাচার হয়ে যায় বলে বহু বাংলাদেশির অভিযোগ। বাংলাদেশে এখন পুরনো বিদেশি জামা-কাপড় আমদানি হচ্ছে জাহাজ বোঝাই করে। সে সব মাল ভারতে পাচার হচ্ছে। স্থলপথে যাঁরা ভারতে যান তাঁদের নাকি ভারত সীমান্তে ভারতীয় পুলিশ পাসপোর্ট পিছু দশ টাকা করে ঘুষ নিচ্ছে। এছাড়া বনগাঁর ভেতর ঢুকলে চাঁদার জন্য স্থানীয় ছোকরাদের উৎপাত আছে।

উষ্ণ আতিথেয়তা

বাংলাদেশে সর্বত্র উষ্ণ আতিথেয়তা জুটেছে। অবশ্য সরকারি পদস্থ অফিসাররা যথাসম্ভব ভারতীয় সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন।

কিন্তু সাধারণ বেসরকারি মানুষের আন্তরিকতা ভোলার নয়। খুলনা প্রেস ক্লাব একটি চা চক্রের আয়োজন করেন। খুলনার বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক ট্রিবিউনের সম্পাদক ফেরদৌস আলি আমাকে সপরিবারে তাঁর বাড়িতে নৈশ-ভোজে আমন্ত্রণ জানান। সাতক্ষীরার বিখ্যাত চিকিৎসক ও প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ আফতাবুজ্জামান সুন্দরবন দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাতক্ষীরাতে স্থানীয় প্রেসক্লাবের সদস্যরা দল বেঁধে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সাতক্ষীরাতে স্থানীয় শিল্পীরা আমাকে নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনান। বাংলাদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রয়েছে। খুলনার বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী সাধন ঘোষের নাম সকলের মুখে মুখে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা পেলাম না।

কবি স্মৃতি বাংলাদেশে

বাংলাদেশের গ্রামে গেলে এখনও সবুজ শ্যামলিমায় ভরা

বঙ্গজননীর স্নিগ্ধ রূপ চোখে পড়ে। গ্রামের বন কেটে বসত খুব কমই হয়েছে। তবে বহু গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। আগে যেখানে নদী-পথ ছাড়া যাওয়া যেত না, এখন সেখানে রাস্তাঘাট হয়েছে। রাস্তার অবস্থা সব জায়গায় ভাল নয়। আমরা যশোর থেকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া হয়ে নদী পেরিয়ে শিলাইদহ গেলাম। প্রায় ৮ কিলোমিটার সাইকেল ভ্যানে করে যেতে হল। সরু পিচের রাস্তা তৈরি হয়েছে শিলাইদহ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের কুঠি বাড়িটি সুন্দর-ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কোন কাগজে দেখেছিলাম পদ্মার ভাঙনে কুঠি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একদম বাজে কথা। পদ্মা কুঠি বাড়ি থেকে এখন প্রায় আধ মাইল দূরে। ছাদে না উঠলে দেখা যায় না। কুঠি বাড়ি সংরক্ষণের জন্য একজন কিউরেটর আছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল পালকি স্পিডবোট সব সাজান আছে। ভারত সরকার কিছু ছবি দিয়েছিলেন। এই কুঠি বাড়িটিকে একটি পরিপূর্ণ যাদুঘরে রূপান্তরিত করার জন্য বিশ্বভারতী ভারত সরকারের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন। কুঠি বাড়ির পরিবেশটি বড় সুন্দর। সামনে একটি নতুন রেস্ট হাউস করা হয়েছে। পঁচিশে বৈশাখ এখানে প্রতি বছর উৎসব হয়।

যশোর থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত এখন দুটো ভাল রাস্তা হয়েছে। একটি রাস্তা নাভারণ দিয়ে। আমরা কেশবপুরের মধ্য দিয়ে গেলাম। কেশবপুর হিন্দু-প্রধান গ্রাম। আর একটু এগিয়ে সাগর দাঁড়ি যাবার রাস্তা। নাম মধুসরণি। সরু পিচঢালা রাস্তা মাইল দশেকের মত হবে। কপোতাক্ষ নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে মাইকেলের নামে একটি পাঠাগার আছে। কবির জন্মভিটে ভেঙে গিয়েছে। তার মাঝে যে ঘরে কবি জন্মেছিলেন, তার ভিতটা রয়েছে। সেখানে একটি স্মৃতি ফলকে এটি লেখা।

কবির জ্ঞাতিদের পুজো মণ্ডপে বারোয়ারি দুর্গাপুজো হচ্ছে দেখলাম। মাইকেলের জন্মদিনে এখানেও মেলা বসে, সাহিত্যসভা হয়।

খুলনার ফুলতলা গ্রামে রবীন্দ্র-নাথের শ্বশুর-বাড়ি দেখতে গিয়ে-



ষাট গম্বুজ মসজিদ : বাগের হাট

ছিলাম। এই বাড়িতে স্থানীয় এক মুসলমান চাষী বাস করেন। দোতলা বিরাট বাড়িটির এখন জীর্ণদশা। আমার সঙ্গে ফুলতলার উপজেলা অধিকর্তা আবুবকর সাহেব ছিলেন। তিনি বললেন: এই বাড়িটি সরকার থেকে সংরক্ষণ করলে ভাল হয়। কিন্তু তাঁর হাতে এমন কোন আইন নেই যে তিনি বাড়িটি নিতে পারেন। তবে সরকার টাকা দিলে বাড়ির বর্তমান মালিক বাড়িটি ছেড়ে দিতে রাজি। এখানেও পঁচিশে বৈশাখ সাহিত্য সভা-টভা হয়। গ্রামের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি বলতেই এক ডাকে চেনেন।

পুরা-কীর্তির মধ্যে বাগের হাটে বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখতে গিয়েছিলাম। এটি প্রাচীন বাংলার এক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি।

মসজিদের আয়তনও কম নয়। কিন্তু দেখে মনে হল উপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষণের অভাব রয়েছে। বাগের হাটে খাঁজাহান আলির মাজারে গিয়েছিলাম। সামনের দীঘিতে নাকি বংশানুক্রমে চার পাঁচটি কুমির বাস করছে। কিন্তু আমরা কোন কুমিরের দর্শন পেলাম না। বাগের হাট রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলাম। মিশনটি একটি ছাত্রাবাস চালায়। পাক হামলার সময় মিশনটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ হবার পর আবার চালু হয়েছে। তবে ১৯৭২ থেকে আর কোন নতুন মিশন খোলা হয়নি। খৃস্টান ও মুসলমানদের মত হিন্দুদের কোন আন্তর্জাতিক ধর্ম আন্দোলন নেই। তাই স্থানীয় সাহায্যের ওপরেই নির্ভর করতে হয় তাঁদের। স্থানীয় সাহায্য খুবই কম। তাই টিম টিম করে মিশন-গুলি টিঁকে আছে।

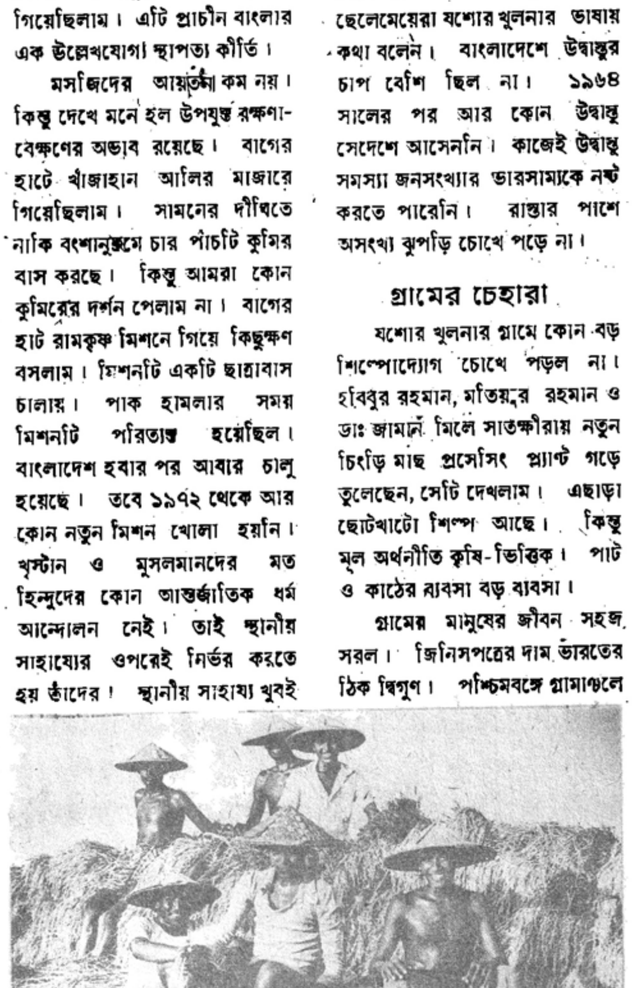
পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু

যশোর খুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক উদ্বাস্তু মুসলমান বাস করছেন। যশোরের জনসংখ্যার ষাট ভাগ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু। মুখ্যত ওঁরা ২৪ পরগণার লোক। আমার কলেজজীবনের কয়েকজন বন্ধুকে পেয়ে খুব ভাল লাগল। এঁরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। যেমন হবিবুর রহমান একের পর এক শিল্প তৈরি করে চলেছেন। হানিফ দফাদার একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। মোনায়েম বলে আমার এক সহপাঠী শিক্ষাপর্ষতের কর্মচারী সমিতির সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা যশোর খুলনার ভাষায় কথা বলেন। বাংলাদেশে উদ্বাস্তুর চাপ বেশি ছিল না। ১৯৬৪ সালের পর আর কোন উদ্বাস্তু সেদেশে আসেননি। কাজেই উদ্বাস্তু সমস্যা জনসংখ্যার ভারসাম্যকে নষ্ট করতে পারেনি। রাস্তার পাশে অসংখ্য ঝুপড়ি চোখে পড়ে না।

গ্রামের চেহারা

যশোর খুলনার গ্রামে কোন বড় শিল্পোদ্যোগ চোখে পড়ল না। হবিবুর রহমান, মতিয়ুর রহমান ও ডাঃ জামান মিলে সাতক্ষীরায় নতুন চিংড়ি মাছ প্রসেসিং প্ল্যান্ট গড়ে তুলেছেন, সেটি দেখলাম। এছাড়া ছোটখাটো শিল্প আছে। কিন্তু মূল অর্থনীতি কৃষি-ভিত্তিক। পাট ও কাঠের ব্যবসা বড় ব্যবসা।

গ্রামের মানুষের জীবন সহজ সরল। জিনিসপত্রের দাম ভারতের ঠিক দ্বিগুণ। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ভিখারি কম। বাংলাদেশে গ্রামে ভিখারি বেশি। ফেরিঘাটগুলোতে গেলে ভিখারি ছেঁকে ধরে। এক-শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচণ্ড পয়সা। আমি বহু লোককে বিদেশি সিগারেট খেতে দেখেছি। গ্রামের দোকানে কনজিউমার্স গুডস সামান্যই বিক্রি হয়। পশ্চিমবঙ্গে যেমন গ্রামে নব্য বড়লোক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, বাংলাদেশে তেমন শ্রেণী নেই। বড় লোকেরা অধিকাংশই শহরে বাস করেন। তাছাড়া সবাই এখন ঢাকা-কেন্দ্রিক। খুলনার মত শহর আজও উপেক্ষিত। সেখানে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যন্ত নেই। যশোর শহরেরও কোন উন্নতি হয়নি। শুধু বেসরকারি উদ্যোগে এখানে ১৫শো আসনের একটি অত্যাধুনিক সিনেমা হল তৈরি হয়েছে। খুলনা কুষ্টিয়া শহর দুটির অনেক অংশ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুলনা থেকে অনেকগুলি দৈনিক বেরোয়। প্রায় সব শহরেই একটা করে প্রেস ক্লাব আছে।



বাংলাদেশ : ধানকাটার মরশুম

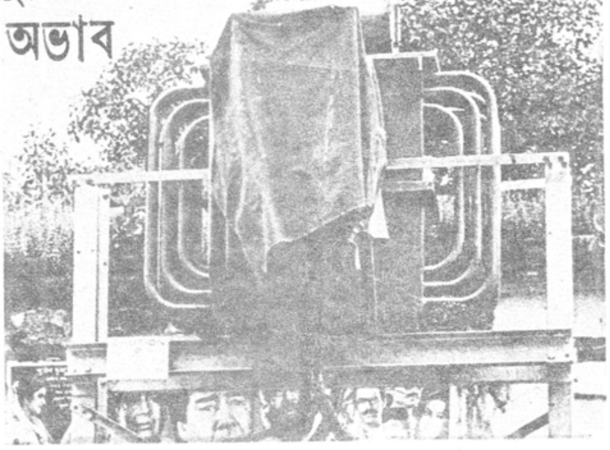
জেলা ভেঙে মহকুমাগুলোকেও এখন জেলা করা হয়েছে। থানা-গুলিকে উপজেলা করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে প্রশাসন সাধারণ মানুষের কাছে চলে এসেছে। আগে সাধারণ মানুষকে জেলা শহরে ছুটতে হত বিচারের জন্য। এখন উপজেলা কেন্দ্রে গেলেই বিচার পাওয়া যাবে। উপজেলা প্রশাসনে পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আর নির্বাহী অফিসার সিভিল সার্ভেন্ট। পদমর্যাদায় তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট। অনেক জায়গায় নির্বাহী অফিসার-দের সঙ্গে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতার লড়াই দেখা দিয়েছে। চেয়ারম্যানরা প্রশাসনের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। তাছাড়া গ্রামের রাজ-নৈতিক চাপতো প্রশাসনের ওপর আছেই। এর ফলে এরশাদ সাহেবের একটা ভাল নীতি কার্যকর হতে পারছে না।

এক কথায় এক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশের চারটি জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল। ঢাকায় যাই হোক না কেন, তার ঢেউ গ্রাম জীবনকে খুব কমই স্পর্শ করে। শহর এলাকায় আইন শৃঙ্খলার সমস্যা থাকলেও গ্রামাঞ্চলে মানুষ অনেক শান্তিতে বাস করছেন বলে আমার ধারণা হল। □

ফটো: পার্থ চট্টোপাধ্যায়



এখন বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য দায়ী চুরি, অর্থ সঙ্কট আর ট্রান্সফর্মারের অভাব



বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার। ফটো: শংকর নাগ দাস

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের উৎপাদন শতকরা ২৭ ভাগ বেড়েছে। লোড-শেডিং কিন্তু কমেনি। বরং বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোডশেডিংও বেড়েছে। পশ্চিম-বঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ এই বাড়তি বিদ্যুৎ ঠিকমত বণ্টন করতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দারুণ সঙ্কট। অথচ বিদ্যুৎ পর্ষদ বাড়তি বিদ্যুৎ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে পর্ষদের কর্তৃত্বে আছেন এমন কিছু পুরানো ব্যক্তির অধৈর্য উক্তি হল: 'এর থেকে বিদ্যুতের উৎপাদন না বাড়ানই ভাল ছিল। তাহলে আর এই বিদ্যুৎ বণ্টন নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত না।' কিন্তু সমস্যা তো আরো বাড়বে। কারণ, দু-তিন বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়বে। যেমন কোলাঘাটে দ্বিতীয় ইউনিট চালু হয়ে গেলে পাওয়া যাবে ২১০ মেগাওয়াট, ফরাক্কা দেবে ২১০ মেগাওয়াট (প্রথম ইউনিট চালু হলেই)। এছাড়া দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এবং চুখা হাইডেল প্রজেক্টও বিদ্যুৎ দেবে। বিদ্যুতের বাড়তি উৎপাদন এবং বাইরে থেকে আসা বিদ্যুৎ নিয়ে পর্ষদের মাথা ব্যথার শেষ নেই। কারণ বর্তমান বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা দিয়ে এই বাড়তি বিদ্যুৎ বণ্টন করা কখনই সম্ভব হবে না।

উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে সোজা এসে সুইচ-ইয়ার্ডে পড়ে ৪,০০,০০০ ভোল্টেজে। এই বিশাল শক্তির বিদ্যুৎ দিয়ে আমার আপনার আলো জ্বলে না, কলকারখানাও চলে না। এই ভোল্টেজকে বিভিন্ন ভোল্টেজে নামিয়ে এনে আমাদের গ্রহণযোগ্য বিদ্যুতের ভোল্টেজে রূপান্তরিত করতে হয়। গ্রহণযোগ্য বিদ্যুতের আবার ভাগ আছে। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান নেয় একটা ভোল্টেজে, ছোট-মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান নেয় একটা ভোল্টেজে, সল্ট লেক স্টেডিয়াম নেয় একটা ভোল্টেজে, ছোট আটা চাকি বা ধান কল নেয় একটা ভোল্টেজে। আর আমি-আপনি নিই একটা ভোল্টেজে। বিদ্যুৎকে এই বিভিন্ন ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে ট্রান্স-ফর্মার। বিদ্যুৎ বণ্টনের প্রাণ হল এই ট্রান্সফর্মার। ট্রান্সফর্মার ছাড়া বর্তমান ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষে বিদ্যুৎ বণ্টন করা সম্ভব নয়। অথচ এই ট্রান্সফর্মারের অভাবেই বিদ্যুৎ পর্ষদ ঐ বাড়তি বিদ্যুৎ বণ্টন করতে পারছে না। কারণ পশ্চিম-বঙ্গের যে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি বছরে যে কটি ট্রান্সফর্মার তৈরি করে তা দিয়ে পর্ষদের চাহিদা মেটে না। তাছাড়া পর্ষদের বাজেটে ট্রান্সফর্মার কিনতে যে টাকা ধরা হয় তার সঙ্গে ট্রান্সফর্মার নির্মাতা-দের উৎপাদন খরচের হিসেবে অনেক ফারাক থেকে যায়। পর্ষদের বিদ্যুৎ বণ্টন পরিকল্পনার সঙ্গে, ট্রান্সফর্মার নির্মাতাদের উৎ-পাদন পরিকল্পনার কোন মিল থাকে না। অথচ নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগীরা ট্রান্সফর্মার নির্মানে এগিয়ে আসছেন না। কারণ ট্রান্সফর্মার নেবে পর্ষদ। তাছাড়া তেমন চাহিদা কোথায়? পর্ষদ যখন নেবে না, তখন ঐ শিল্পের অবস্থা কী হবে? এই সমস্যা বড় জটিল। সরকার গ্রাম বৈদ্যুতী-করণ প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের তার ছড়িয়ে দিয়েছে। অথচ আলো নেই। যাও বা আছে তাও টিমটিম করে জ্বলে। অর্থাৎ আইনত আলো জ্বলছে। কিন্তু কেন? বিদ্যুতের তার আছে, বিদ্যুৎ আছে, তাহলে আলো জ্বলবে না কেন? কারণ ভোল্টেজ কম। ভোল্টেজ বাড়াবে-কমাবে তো ট্রান্সফর্মার। সেই ট্রান্সফর্মারই নেই।

আরও একটা কারণ আছে। ব্যাপক তার চুরির জন্য অ্যালু-মিনিয়ামের তারের বদলে অনেক জায়গায় লোহার তার লাগান হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়াম থেকে লোহার তারের বিদ্যুৎকে বাধা দানের **(Resistance)** ক্ষমতা সাত-আট গুণ বেশি। লোহার তার দিয়ে বিদ্যুৎ ঠিকমত সরবরাহ করা যায় না। লোহার তারের এক মাথায় যে ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পাঠান হয়, অন্য মাথায় সেই ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পৌঁছয় না। ফলে টিমটিম করে আলো জ্বলে। কোথাও আবার আলোই জ্বলে না। আবার ভোল্টেজ হঠাৎ বাড়ে-কমে বলে পাম্পে জল ওঠে না। মোটর পুড়ে যায়। বাল্ব কেটে যায়, টি ভি নষ্ট হয়, মেইন সুইচের ফিউজ উড়ে যায়। আবার এই লোহার তার বাদ দিয়ে অ্যালু-মিনিয়ামের তার লাগালেই কি আলো ঠিকমত জ্বলবে? না। কারণ এক একটা বিদ্যুতের লাইন যায় ১৫০-২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এত লম্বা লাইনে তার গেলে সেটা যদি লোহার না হয়ে অ্যালু-মিনিয়ামের হয় তাহলে ভোল্টেজ কমে যাবে। কারণ লম্বা লাইনে এক মাথায় যে ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পাঠানো হয় সেই ভোল্টেজে বিদ্যুৎ যেতে যেতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে ভোল্টেজ কমতে শুরু করবে। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দূরত্বের মাঝে যদি সাব-স্টেশন বসিয়ে ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে ভোল্টেজ আবার বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে অন্য প্রান্তে ভোল্টেজ ঠিক থাকবে। সাব-স্টেশন বসিয়ে ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে যেখানে যে পরিমাণ ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে তাকে বাড়িয়ে দিতে না পারলে এ সমস্যা থেকেই যাবে। কিন্তু উপায় নেই। ট্রান্স-ফর্মার কোথায়? ট্রান্সফর্মারের বদলে বিদ্যুতের ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানোর অনেক আধুনিক উপকরণ অন্যান্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ব্যবহার করছে। এই রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদ তার খোঁজ রাখে না। পর্ষদের লোকজন জানেন না যে, গ্রামে গ্রামে বা মফস্বল শহরে যে ট্রান্স-ফর্মারগুলি বসানো আছে তার সব কটি চালু আছে কিনা। ট্রান্স-ফর্মারের তেল প্রায়ই চুরি হয়ে যায়, ট্রান্সফর্মার পুড়ে যায়। ট্রান্স-ফর্মার রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না বলেই বিদ্যুতের লাইনের বারোটা বাজছে। বিদ্যুৎ থেকেও আলো জ্বলছে না।

এবছর বিদ্যুৎ পর্ষদের পরি-কল্পনা হল ১৬ হাজার শ্যালো টিউবয়েল বসান এবং ২১ হাজার মৌজা বৈদ্যুতীকরণ করা। এর জন্য পর্ষদের এখনই প্রয়োজন ছয় হাজার ট্রান্সফর্মার। এছাড়া সাধারণ বৈদ্যুতীকরণ ও বণ্টন ব্যবস্থা তো আছেই। তার জন্যও তো ট্রান্সফর্মার প্রয়োজন। তাছাড়া গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতীকরণে পর্ষদের এ বছর প্রয়োজন ২ লাখ ৫০ হাজার 'কংক্রিট কাস্টিং পোল' যা দিয়ে বিদ্যুতের তার টানা হবে। পশ্চিম-বঙ্গে এই কাস্টিং-এর কাজ অল্প কয়েকজন কন্ট্রাক্টর করেন। পর্ষদ এ'দের সিমেন্ট সরবরাহ করে। ওঁরা কাস্টিং করে দেন। পর্ষদ তারের পয়সা দিয়ে দেয়। কিন্তু পর্ষদ কাস্টিং পোল তৈরির জন্য কন্ট্রাক্টরদের প্রয়োজনীয় সিমেন্ট দিতে পারেনি। ফলে পর্ষদের আশঙ্কা হচ্ছে ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি পোল হয়ত সর-বরাহ পাবেন না। সুতরাং বলা যায়, এবছর গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতী-করণ প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবে রূপায়িত হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের আর্থিক ব্যাপারের পরিচালনা অত্যন্ত দুর্বল। বরং বলা যায় যে, একেবারেই কার্যকর নয়, প্রতিবছর পর্ষদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ

বাড়ছে। ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে বিদ্যুতের ট্রান্সমিশন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে। ক্ষতি বাড়ছে অল্প-শক্তির (Low tension) বিদ্যুৎ বিক্রির ক্ষেত্রে। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে বিলের টাকা বাকি থাকছে। পর্ষদ আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে নতুন নতুন অফিসার পদের সৃষ্টি ও নিয়োগ করে পর্ষদ দিনদিন মাথাভারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। পর্ষদের যাঁরা পুরনো ব্যক্তি, যাঁরা উঁচু পদে বসে আছেন, তাঁদের ধারণা হল, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ একটা কোম্পানি। যেহেতু এটা একটা কোম্পানি, সেইহেতু একে লাভজনক সংস্থা হতেই হবে। লাভজনক সংস্থা যদি হতে হয় তবে ৪০০ ভোল্টে বিদ্যুৎ বেশি দিলে লাভ হবে না। কারণ যত কম ভোল্টে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে তত ট্রান্সমিশন ও বণ্টনে ক্ষতি হবে। সুতরাং যত বেশি বিদ্যুৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হবে ততই লাভ। এমনিতে পর্ষদ কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে মোট বিদ্যুতের ৪০-৫০ শতাংশ দিয়ে দেয়। কিন্তু ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর বিদ্যুৎ নেওয়ার পরিমাণ কমছে। কারণ সি ই এস সি নিজে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াচ্ছে। টিটাগড়ে নতুন ৪-টে ইউনিট হয়েছে। পূর্বোক্ত পুরনো ব্যক্তিদের ধারণা, পর্ষদের সমস্ত বিদ্যুৎ যদি সি ই এস সি নিয়ে নিত তবে সব থেকে ভাল হত। তখন এই বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন ও আমার আপনার বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার ঝামেলা থাকত না; মিটার রিডিং, বিলিং এবং টাকা সংগ্রহের ঝামেলাও কমে যেত। সমস্ত গ্রামাঞ্চল, মফস্বল ও জেলা শহর অন্ধকারে থাকত। তাতে কী হয়েছে? পর্ষদ তো লাভজনক সংস্থায় পরিণত হত!

পর্ষদের আর্থিক দিকটির পরিচালনার কর্তৃত্বে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা কি জানেন না যে, মফস্বল ও জেলা শহরের অধিকাংশ বাড়িতে 'মিটার রিডিং' ঠিকমত হয় না। দীর্ঘদিন বাড়ি বাড়ি বিদ্যুতের বিল যায় না। অধিকাংশ মিটারই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। বর্তমানেও যে মিটারগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে তার অধিকাংশই খারাপ। যাঁরা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বিদ্যুৎ বিক্রিতে উৎসাহী তাঁরা কি জানেন না যে, এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বেশির ভাগই বিলের টাকা দেয় না। পর্ষদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির নজির টেনে আদালতে মামলা রজু করে লক্ষ লক্ষ টাকা বাকি রেখে দেয়। পর্ষদের এই অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ বর্তমানে কোটির অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে। গত ১৯৮২ থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত পর্ষদের আয় ও অনাদায়ী টাকার একটা চিত্র তুলে ধরলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

সারণি-১ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যাঁরা 'বাল্ক কনজিউমার্স' অর্থাৎ ৫০০ কিলো ভোল্টের বেশি বিদ্যুৎ নেন, তুলনামূলকভাবে তাঁদের থেকে যাঁরা কম শক্তির বিদ্যুৎ নেন তাঁদের ক্ষেত্রে পর্ষদের আয় বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি। এবার অনাদায়ী অর্থের পরিমাণটি দেখা যাক। (সারণি-২)

১৯৭৯-৮০ সাল থেকে প্রতি-বছর পর্ষদের বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন ও বণ্টনে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। অথচ এই ক্ষতি রোধে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা পর্ষদ গ্রহণ করতে পারেনি। ৭৯ থেকে ৮৪ এই ছ বছর ধরে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতির হার কমছে না। বরং বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এই ছয় বছরে, ক্ষতি বন্ধ হয় এমন কোন ব্যবস্থা পর্ষদ গ্রহণ করতে পারল না। সেরকম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ক্ষতির হার অন্তত কমত। সারণি-৩ থেকে বছর-বছর এই ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধির হিসেবটি পাওয়া যাবে।

১৯৮০ থেকে ৮৪ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে ২৪২'৭৭ কোটি টাকা।

এই ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৮০-৮১ সালে ক্ষতির পরিমাণ ৩৯'৮১ কোটি টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে ৬৩'১১ কোটি, ১৯৮২-৮৩ সালে ৬৯'৪৭ কোটি এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ৭০'৩৮ কোটি টাকা।

এছাড়া আছে ব্যাপক চুরি। পর্ষদের নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি গোপন নোটে জানিয়েছে যে, ১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে পর্ষদের ৪'৩৭ কোটি টাকার সম্পত্তি চুরি হয়েছে। এই গোপন নোটে নিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে, পর্ষদের এক শ্রেণীর কর্মীর যোগ-সাজসে এই ব্যাপক চুরি চলছে।

পাহাড়ে, নদীর ধার দিয়ে বা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যখন ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন টানা হয় তখন কোটি কোটি টাকার তার, টাওয়ার সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকে। অথচ পর্ষদের এই সব জিনিসপত্র পাহারা দেবার ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতি বছরই কোটি কোটি টাকার জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে।

একবার ভেবে দেখুন তো অনাদায়ী অর্থ যদি পর্ষদ ঠিকমত আদায় করতে পারত, যদি বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন বণ্টনের ক্ষতি বন্ধ করতে পারত, পর্ষদের যদি এত ব্যবসায়িক ক্ষতি না হত, এবং একমাত্র অবহেলার দরুন প্রতি বছর যে বিশাল অঙ্কের সম্পদ চুরি হচ্ছে তা যদি পর্ষদ রোধ করতে পারত তাহলে কত কোটি টাকা পর্ষদের ভাণ্ডারে জমা পড়ত? সে টাকা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিদেন পক্ষে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট নির্মাণ করা সম্ভব হত। পর্ষদ কি দিনের পর দিন চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই ক্ষতি দেখে যাবে, আর রাজ্যে লোড শেডিং-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে? ☐

তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

সারণি-৩

বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন ও বণ্টনে ক্ষতি
(১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৩-৮৪)

১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪
১২'২৯%	১৪'০০%	১৫'৫৬%	১৯'৮৯%	১৯'০০%

সারণি-২

অনাদায়ী টাকার হিসেব
(৩১.৩.৮৫ অবধি)

বিভিন্ন প্রকার গ্রাহক (প্রত্যেকেই ৫০০ কিলো ভোল্টের বেশি বিদ্যুৎ নেন)	টাকার হিসেবে
ক) যাঁদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের লাইসেন্স জাতীয়করণ করা হয়েছে। (বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানার বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি জাতীয়করণ করা হয়)	৫৭,৪৩,৫৪০'১৯
খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে অনাদায়ী অর্থ। (সরকারি হস্তক্ষেপে যাঁদের বিদ্যুতের লাইন কাটা হয়নি।)	৫২,২৪,১৭৪'৪৭
গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে অনাদায়ী (যাঁদের সঙ্গে মামলা চলছে)	৩,৪৯,৮৫,৭০৪'৩০
ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে অনাদায়ী (বিদ্যুৎ শুল্ক বাকি থাকায় যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।)	৩৩,৩৩,০৭৬'৬৪
ঙ) অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে অনাদায়ী	২,২০,১৩,৩৩৬'২২
	৭,১২,৯৯,৮৩১'৮২

সারণি-১

পর্ষদের বাৎসরিক আয়ের হিসেব ১৯৮২-১৯৮৫
(লক্ষ টাকার হিসেবে)

গ্রাহক	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
ক) সেন্ট্রালাইজড বাল্ক কনজিউমার্স (যাঁরা ৫০০ কিলো ভোল্টের বেশি বিদ্যুৎ নেন)	১৪৫০৩'১৭	১৩৫২৭'১৬	১৪৯৫৫'২৬
খ) ডিসেন্ট্রালাইজড বাল্ক ও লো-টেনশন কনজিউমার্স (যাঁরা ৫০ থেকে ৫০০ কিলো ভোল্টের বিদ্যুৎ নেন)	৪২২৩'৫০	৫৯৯০'৮৪	৭১১৬'০৩

এক বাল্‌বের চমৎকারের ধোঁকায় আপনি বোকা বনতে পারেন!



বাল্‌বের সম্পর্কে চমৎকার-চমৎকার কথায় আপনি হয়তো চমৎকৃত হয়ে যেতে পারেন। বহুকাল চল্‌বে, চমৎকার জ্বলবে, ইত্যাদি ঢাক পেটানোয় আপনি দিশাহারা।

আপনার পক্ষে তো, কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যা যাচাই করে দেখা সম্ভবপর নয়। কারণ, সব বাল্‌বই দেখতে সমান...শুরু-শুরুতে সবই চমৎকার।

কেবল কিছুকাল পরেই, আজেবাজেটির কেচ্ছা-কাহিনী আপনি-ই বেরিয়ে পড়ে। বদগুণ একে-একে প্রকাশ পায়, যেমন আলো কমছে তো কমছে, বিজলী খরচ পুরোমাত্রায় চড়ছে, তারপর বাল্‌ব 'ফুট্‌' করে খতম।

তাহলে, সত্যিই তো, আপনি কি করে চিনবেন কোন বাল্‌বটা নিখুঁত আর সেরা।

দেখুন সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'ল এমন এক নামী বাল্‌ব কিনুন, যার ওপর ৫০ বছরেরও বেশীকাল ধরে জনগণের অগাধ বিশ্বাস।

ফিলিপ্‌স...এমন এক কোম্পানী, যারা প্রত্যেকটি বাল্‌বকে ১০০% ভাগ যাচাই-পরখ করে, যার ফলে আপনার খরচা ওয়াটের ১০০% ভাগ উশুল হয়ে আসে।

সুতরাং, ১০০% নিশ্চিত হোন। শুধু ফিলিপ্‌স-ই কিনুন।



সব বাল্‌ব-ই দেখতে সমান, কিন্তু ফিলিপ্‌স নাম সেরা বলে প্রমাণ

ফিলিপস – গত পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল ভারতের ঘরে-ঘরে বিশ্বস্ত নাম

প্রচ্ছদ কাহিনী

সিনেমা হলের ভেতর তরুণী খুনের নেপথ্য কাহিনী

তরুণী বধূ রীতা দমদমে এক সিনেমা হলে সিনেমা চলাকালে নৃশংসভাবে নিহত হন। সারা ভারতে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড এই প্রথম।
তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের,
অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট।



নিহত রীতা। বক্সের আসনের পাশে পড়ে আছে তাঁর গলা কাটা দেহ। ফটো: অমলকুমার ঘোষ



সিনেমা হল 'চেতনা'

হিন্দি ছবি 'মাস্টারজীর' প্রায় মাঝরাতের একটি দৃশ্য। শ্রীদেবী একটি শিশুকে কোলে নিয়ে গান গাইছেন। পাশে দাঁড়ান রাজেশ খান্না। শ্রীদেবীর দু চোখ বেয়ে জল পড়ছে। গানের মাধ্যমে সে বোঝাতে চাইছে যে, এই ছোট্ট ছেলেটি রাজেশ খান্নার মৃতা স্ত্রীর হলেও তিনি ছেলেটিকে নিজের সন্তানের মতই দেখেন। এর জন্য শ্রীদেবী তো অনেক পরীক্ষা ও প্রমাণ দিয়েছেন। তাহলে রাজেশ খান্না অর্থাৎ 'মাস্টারজি' কেন তাঁকে স্ত্রীর সম্মান বা মর্যাদা দেবেন না? সেও তো সন্তানের মা হতে চায়। 'মাস্টারজি' কেন মনে করছেন যে তাঁর গর্ভে সন্তান হলে বর্তমান শিশুটি অনাদর পাবে?

দমদমের 'চেতনা' হলের পর্দায় দর্শকরা যখন এই আবেগপূর্ণ দৃশ্য দেখছেন, তখন হলেরই বক্সের আসনে চলছে আর এক বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্য। পর্দার আবেগপূর্ণ দৃশ্যে মুগ্ধ দর্শকরা এতটুকু টের পাচ্ছেন না যে, তাঁদেরই মাথার ওপর ঐ বক্সের আসনে চারজন যুবক ঠাণ্ডা মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একজন যুবতীর গলা কাটছেন।

আঠারোটি টিকিট পাঁচজন দর্শক

"বউদি ছেলেটাকে একটু তিন ঘণ্টার জন্য রাখবে? আমি ওর সঙ্গে 'মাস্টারজি' দেখতে যাচ্ছি। বইটা নাকি খুব ভাল হয়েছে। এই তো 'চেতনা' হলে। দুটো-পাঁচটা শো। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এসে সন্তুকে নিয়ে যাব।" সল্ট লেকের পি অ্যাণ্ড টি কোয়ার্টার থেকে দমদমের বাপুজি কলোনিতে বড় বউদির কাছে ১১ মাসের ছেলে সন্তুকে রেখে রীতা সেদিন সিনেমায় গিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। রীতা বেরোবার সময়ও ছোট্ট সন্তু বায়না ধরেছিল মার সঙ্গে যাবে বলে। বউদি ভুলিয়ে রেখেছেন। 'কিন্তু কতদিন এমন ভুলিয়ে রাখব--বলুন তো? ও যে সব সময় মা-মা বলে কাঁদে। ওরা রীতাকে মারার সময় একবারও এই বাচ্চা ছেলেটার কথা চিন্তা করল না?' কথাগুলি বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন রীতার বৃদ্ধা মা প্রকৃতি রানী দাস। 'হায়, স্বাভাবিক মৃত্যু হলে বলতাম মেয়ে আমার পুণ্যবতী। লক্ষ্মী পুজোর দিন মারা গেছে। কিন্তু এযে, উফ!' আর তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ছেলেরা তাঁকে নিয়ে শুইয়ে দিলেন।

সিনেমা হলে নারী হত্যা

সিনেমা হলে নারী হত্যা ভারতে এই প্রথম। গত ২৮ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর দিন দমদমের 'চেতনা' হলে শো চলাকালীন রীতাকে খুন করা হয়। পুলিশের বিবরণ অনুযায়ী দুর্বৃত্তরা রীতাকে হত্যা করে 'শো' শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে, রাতের পটভূমি-সংবলিত একটি গানের দৃশ্যের সময়। সেই সময় হল বেশি অন্ধকার হয়ে যায়। রীতার গলায় ক্ষুর চালিয়ে তাঁর নলী কেটে দেওয়া হয়। ক্ষুরের ঘায়ে তাঁর গলায় ১০"×২" আকারের ক্ষত সৃষ্টি হয়। রক্তে ভেসে যায় বক্সের আসন। শো শেষ হলে দুর্বৃত্তরা অন্য সব দর্শকদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

বছর সাত-আট আগে রীতার বাবা-মা অনেক আশা করে বিয়ে দিয়েছিলেন। রীতার প্রথম স্বামী থাকতেন অশোকনগরে। ডাক নাম স্বপন। স্বপন একটা মুদির দোকানে কাজ করতেন। বিয়ের সময় নগদ প্রায় হাজার টাকা পণ হিসেবে দেওয়া হয়। সঙ্গে কিছু সোনা-দানা। রীতার স্বামী স্বপন ঠিক মতন সংসার চালাতে পারতেন না। রীতা সেখানে সুখী হননি। স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তিনি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসেন বাপের বাড়িতে। বাপের বাড়ি দমদমের দক্ষিণপাড়ায়। রীতা একমাত্র মেয়ে। তাঁর চার ভাই। বাবা ডাক ও তার বিভাগে কাজ



করেন। একটি চালা ঘর। পেছনে বারান্দা ও ছোট্ট রান্নার জায়গা। সংসার সচ্ছল না হলেও ভাইরা রীতাকে সাদরে গ্রহণ করে নেন।

দমদমের দক্ষিণপাড়া থেকে কাজিপাড়ার উমা জুয়েলার্স বেশি দূরে নয়। মালিক গণেশ স্বর্ণকার অতি নিরীহ লোক। জোরে কথা বলেন না। মুখে সর্বদা হাসি। খদ্দের তাঁর কাছে লক্ষ্মী। বয়স ৩৩। তিন ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবারে গণেশ মেজো। আজ থেকে নয় বছর আগে গণেশের বিয়ে হয়। তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ে। তাঁর বড় ভাইয়েরও সোনার দোকান। বেশ পয়সা-ওয়ালা পরিবার। নিজেদের বাড়ি কাজিপাড়াতেই। সাংসারিক অনটন মেটানোর জন্য রীতা মায়ের সঙ্গে উমা জুয়েলার্সে যেতেন সোনা বন্ধক দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিয়ের সময় রীতা যা পেয়েছিলেন তাই মাঝে মধ্যে বন্ধক দিয়ে উমা জুয়েলার্সের মালিক গণেশ স্বর্ণকারের থেকে টাকা নিতেন। গণেশও তাঁকে আপদে—বিপদে সাহায্য করতেন। এইভাবে আলাপ। আলাপ থেকে ভাব। ভাব থেকে প্রেম। প্রেম থেকে 'পরিণয়'। প্রেম চলাকালীন রীতাই গণেশকে বলেন, 'এইভাবে আর কতদিন চলবে, তুমি আমাকে বিয়ে কর।' গণেশ রাজি হন। কিন্তু গণেশ বলেন যে, রীতাকে নিয়ে তাঁর পরিবারে থাকার অসুবিধা আছে। বাড়িতে মেনে নেবে না। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে রীতাকে তিনি রাখতে পারেন। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা হলেও টানাটানির সংসারে রীতা নিজেকে বোঝা বলে মনে করতেন। তিনি ভাড়া বাড়িতেই থাকতে রাজি হন। রীতার মা ও বড়দার কথা অনুযায়ী, রীতা তখন জানতেন না যে, গণেশ বিবাহিত। আর গণেশের বাড়ির কথা হল, তাঁরা রীতা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। গণেশ রীতাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে 'বিয়ে' করেন। রীতা 'বিয়ে' করে বাড়ি যান। বাড়িতে সব খুলে বলেন। বাড়ির লোক শুনে আশ্বস্ত হয় যে, যাক, মেয়েটার ভালই একটা গতি হল। গণেশ রীতাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ধীরে ধীরে যখন প্রকাশ পায় গণেশ বিবাহিত, তখন



'মাস্টারজির' এই দৃশ্যে রীতাকে খুন করা হয় বলে পুলিশের অনুমান

আর কিছু করার নেই। রীতা নিজেই সব মেনে নেন। বিয়ের পর কদিন রীতা নিজের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঘুরে কাটান। পরে সল্ট লেকের ডাক-তার বিভাগের একটা কোয়ার্টার ভাড়া করে থাকতেন। কোয়ার্টারটি জনৈক ডাক-তার বিভাগের কর্মচারীর। ফ্ল্যাট নং সি সি ১/৭/৯। রীতার সঙ্গে ওঁর ছোট ভাইও থাকত। গণেশ প্রায় প্রতিদিন দুপুরে ঐ বাড়িতে যেতেন। তাছাড়া সপ্তাহে দু-তিন দিন রাতে ঐ ফ্ল্যাটে থাকতেন। সংসার চালানর খরচ গণেশই দিতেন। এগার মাস আগে রীতার একটি ছেলে হয়। নাম সন্তু। সন্তু প্রায় তাঁর বাবার মতই দেখতে।

সেই ২৬ অকটোবর

গত ২৬ অক্টোবর গণেশ নাকি 'চেতনা' হলের ২৮ অক্টোবরের ম্যাটিনি শো'র ১৮টি বক্সের টিকিট কাটেন। কাউণ্টার থেকে এক-জনকে ছয়টি করে টিকিট দেওয়া বিধিসম্মত। কাউণ্টারে আপত্তি জানালে, গণেশ বলেন পেছনে লাইনে তার আরো চারজন লোক আছেন। তাঁরা পরিবারের সবাই মিলে সিনেমা দেখবেন। এমনিতে হলে ভিড় কম হচ্ছিল। হল কর্মী আর আপত্তি না করে ১৮টি টিকিট দিয়ে দেন। গণেশ টিকিট কিনে রীতাকে খবর দেন। এদিকে গণেশ রাজু, কিঙ্করি ও চন্দ্রকিশোর নামে তাঁর পাড়ার তিনটি ছেলে-কেও সঙ্গে নেন। লক্ষ্মীপুজোর দিন রীতা তাঁর বড়দার বাড়িতে (বর্তমানে বাপুজী কলোনিতে) বৌদির কাছে ছেলেকে রেখে বৌদিরই একটা শাড়ি পরে সিনেমায় যান। বৌদিকে বলেন, গণেশের সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছেন। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সন্তুকে নিয়ে যাবেন। 'চেতনা' হলের 'বক্স' হলের অন্যান্য আসন থেকে একদম আলাদা। অর্থাৎ বক্সের অনেক নিচে রিয়ার ও ফ্রন্ট স্টল। ওপরে ব্যালকনি। বক্সের কুলন্ত বারান্দার মত বক্সে কোন ঘটনা ঘটলে ওপর-নিচ থেকে বোঝার উপায় নেই।

মাঝখানে পথ দুদিকে দুটি করে রো। সামনের রো দুটিতে পাঁচটি করে দশটি আসন। পেছনের রো দুটিতে চারটি করে আটটি আসন। রীতা বসেছিলেন বাঁদিকের পেছনের রো-এর কোণের আসনে অর্থাৎ বি-৫-এ। পাশে গণেশ। তাঁর সামনের রোতে রাজু, কিঙ্করি, চন্দ্রকিশোর আলাদা বসেছিলেন। ইণ্টারভ্যালের সময়ও চিপস ও বাদাম হকাররা ওইভাবে পাঁচজনকে বসে দেখতে পান।



মৃত গণেশ স্বর্ণকার



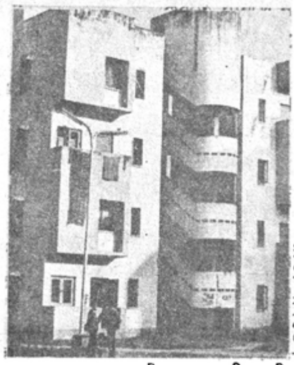
দিদার কোলে মাতৃহারা শিশু সন্তু



তদন্তকারী অফিসার স্বপনকুমার দাস



দমদমের দক্ষিণপাড়ায় রীতার বাপের বাড়ি



সল্ট লেকের পি অ্যাণ্ড টি কোয়ার্টার, যেখানে রীতা থাকতেন

বক্সে আর কোন দর্শক ছিল না। শো শেষ হবার প্রায় মিনিট পনের আগে শেষ গানের দৃশ্যে যখন হল বেশি অন্ধকার হয়ে যায়, তখন রীতার গলা কাটা হয় বলে পুলিশের বক্তব্য। আততায়ীরা রীতার মুখ চেপে ধরেন। হত্যাকারীরা রীতার দেহটি রক্তাক্ত অবস্থায় দেয়াল ও সিটের মাঝে ফেলে রাখেন। শো ভাঙার পর সিনেমা হলের জনৈক কর্মী লাইট নেভাতে গিয়ে মেঝেতে রক্ত দেখে চিৎকার করে ওঠেন। তিনি দৌড়ে অফিসে গিয়ে খবর দেন। সেখান থেকে থানায় ফোন করা হয়।

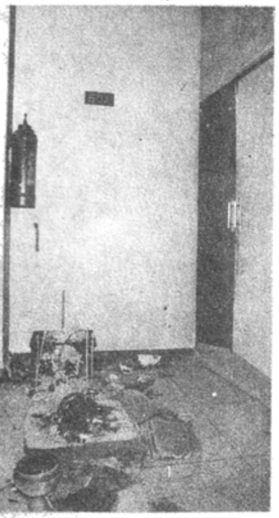
থানায় তখন কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর স্বপনকুমার দাস। খবর পেয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছোটেন।

এদিকে রীতা রাতেও সিনেমা থেকে বাড়ি ফিরলেন না দেখে রীতার বড়দার চিন্তা বেড়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে খবর রটে যায় যে, চেতনা হলে একটা মেয়ে খুন হয়েছে। গণেশের দাদার মন চায় না সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে। তবু তাঁর ভাড়া বাড়ির মালিকের ছেলের অনুরোধে দমদম থানায় গিয়ে তাঁরা খোঁজ করেন এবং ছবি দেখে বোনকে সনাক্ত করতে পারেন। তিনি সাব-ইন্সপেক্টর স্বপনকুমার দাসের (যিনি এই কেসের তদন্তকারী অফিসার) কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন। রীতার বড়দাকে সঙ্গে নিয়ে স্বপনবাবু জিপে করে কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যান। প্রথমে সোজা গণেশের দোকানে। সেখানে গণেশকে না পেয়ে গণেশের বাড়িতে।

এদিকে গণেশ মঙ্গলবার সকালে রীতার বউদির বাড়িতে যান। তখন রীতার বড়দা বেরিয়ে গেছেন রীতার খোঁজে। রীতার বউদিকে তিনি নাকি বলেন রীতার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তাই রীতা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছে তিনি জানেন না। রীতার বউদি গণেশকে 'চেতনা' হলের খুনের কথা জিগ্যেস করায় গণেশ নাকি বলেন 'ও, কিছু না। ওখানে একটা গণ্ডগোল হয়েছে, তাতে বোমাবাজিতে একজন মারা গেছে।' গণেশ বড়দার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের বাড়ি চলে আসেন। পুলিশ যখন তাঁর বাড়িতে যায় তখন গণেশ আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টর স্বপনবাবু গণেশকে বেরোবার মুখেই ধরে ফেলেন। তাঁর বাড়ি তল্লাশি করে রক্ত মাখা জামা-প্যাণ্ট পুলিশ পেয়েছে। পুলিশ বাড়ির কাজের মেয়েটিকেও গ্রেফতার করেছে।

গণেশ পুলিশের কাছে একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

গত ৩১ অক্টোবর গণেশকে ব্যারাকপুর এস ডি জে এসের আদালতে হাজির করা হয়েছিল। তদন্তের সুবিধার জন্য ১৫ দিন পুলিশ হাজতে রাখার আবেদন করা হয়। ঐ দিনই বিকেলে থানায় গিয়ে দেখি পুলিশের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ আদালত থেকে আসামীকে ফেরত আনা হয়েছে। পুলিশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন যে, 'পি—পি এবং কোর্ট ইন্সপেক্টর একটা কথাও বলেননি। বিচারক তদন্তকারী অফিসার স্বপন কুমার দাসের রিপোর্ট পড়ে তারই ভিত্তিতে আসামীকে ৫ দিন পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।'



খুনের ঘটনাস্থল বক্সের সামনে শান্তি স্বস্ত্যয়ন

ওপরের সমস্ত বিবরণ দেওয়া হল পুলিশ, রীতার বাপের বাড়িতে উপস্থিত বড়দা, ছোট ভাই বাবু, রীতার মা, ও গণেশের বড়দার বিবৃতির ওপর ভিত্তি করে। এছাড়া সিনেমা হল গণেশের পাড়ায় ও সল্ট লেকে পি অ্যাণ্ড টি কোয়ার্টারের স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে পাওয়া খবর অনুসারে জানা যায় বাবা মারা যাবার পর দাদাই গণেশের প্রথম বিয়ে দেন। প্রথমা স্ত্রী সারদা স্বর্ণকার বড়বাজারের মেয়ে। এমনিতে গণেশ খুব বাধ্য ছেলে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ নয়। খুনের দিন রাতেও গণেশ বাড়ির সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে টি ভি দেখেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রীতা ইদানীং গণেশের কাছে স্ত্রীর মর্যাদা দাবি করেন। স্থায়ীভাবে তাঁকে একসঙ্গে থাকতে বলেন, রীতা তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানান প্রশ্নও তোলেন।

পুলিশের বক্তব্য: গণেশকে ধরবার জন্য এবং তদন্ত করবার সময় স্থানীয় জনসাধারণ দারুণ সহযোগিতা করেছেন। স্থানীয় ছেলেরা গণেশকে আর ঐ পাড়ায় থাকতে দেবেন না বলে হুমকি দিয়েছেন। ওদিকে দিনের পর দিন পি অ্যাণ্ড টির সরকারি আবাসে বেআইনীভাবে ভাড়াটে হিসেবে তাঁদের থাকতে দিয়েছিলেন ঐ কোয়ার্টারের আসল বাসিন্দা। তবে কেউ কোনদিন একবার খোঁজও করেননি কী হচ্ছে সেখানে। কে রীতার স্বামী, কী রীতার পরিচয়। তাঁর স্বামীর পরিচয়ই বা কী? রীতার আর্থিক পরাধীনতা রীতাকে বাধ্য করেছিল সব মেনে নিতে।

পুলিশ এখন আশাবাদী তাঁরা পলাতক তিন ব্যক্তিকে ধরতে পারবেন। এই তিন ব্যক্তি ধরা না পড়লে রীতা হত্যা মামলাটির সমস্ত সূত্র উদ্ধার করা কঠিন। পুলিশকে এখন প্রমাণ করতে হবে রীতাকে সিনেমা হলের ভেতর কে বা কারা খুন করেছিল। এ ব্যাপারে রীতার স্বামী ধৃত আসামী গণেশের ভূমিকা কী ছিল? না গণেশ একেবারে নির্দোষ?

তাছাড়া পুলিশকে প্রমাণ করতে হবে খুনের উদ্দেশ্য কী ছিল? গণেশ কি রীতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন?

সমস্ত কিছু মিলিয়ে রীতা হত্যাকাণ্ড ভারতীয় অপরাধ কাহিনীতে একটি চমক। যেই খুন করে থাকুক, রীতার মত এক নিঃসহায়া হতভাগিনী নারী স্বামী পুত্র নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বাঁচতে দেওয়া হল না। রীতা খুন হলেন। সাধারণ ভাবে খুন হলে তাঁর এই মৃত্যু নিয়ে তেমন হৈ-চৈ হত না। কিন্তু তিনি খুন হলেন নাটকীয় ভঙ্গিতে।

এদিকে বক্সে দর্শক খুন হওয়ার পর দর্শকেরা ভূতের ভয়ে ওই সিনেমার বক্সের টিকিট কাটা কিছুদিন বন্ধ রেখেছিলেন। তখন হলের মালিক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেন। এরপর আবার বক্স ফুল হচ্ছে। কর্মীরা বলেন, জানেনই তো কারা বক্সে সিনেমা দেখে? যারা দেখার তারা দেখবেই। হল মালিক 'মাস্টারজি' বইটি নাকি অপয়া বলে পাল্টে এখন নতুন বই দেখাচ্ছেন। ☐

ফটো: শংকর নাগ দাস

লম্বা, ঘন, কালো উজ্জ্বল
—চুলের জন্যে—
চিত্রতারকা—
কাজল কিরণের
অত্যন্ত প্রিয়
হিমতাজ তেল।



হিমতাজ তৈল



মাথার যন্ত্রনা দূর করে, মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করে চোখের জ্যোতি বাড়ায়। এক অনুপম মন মাতানো সুগন্ধ ছড়িয়ে সারাদিন আপনার মন প্রফুল্লিত ও স্বতেজ রাখে। একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক উৎপাদন "হিমতাজ" তৈল জনপ্রিয়তায় সবার সেরা। সেরা চুলের জন্যে আপনার ও আপনার পরিবারের সকলেরই প্রিয় "হিমতাজ" তৈল।

পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ শর্মা (বৈদ্যভূষণ) জৌনপুরের তৈরি হিমতাজ তেল

১৬১/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,(ভাঙ্গর বিল্ডিং) কলিকাতা-৭০০০০৭

যুবমন

গত সংখ্যা থেকে এই নতুন বিভাগটি চালু হয়েছে। এই বিভাগে যুবক-যুবতীদের জন্য থাকবে নানা খবর—চাকরির খবর, স্বনির্ভর কীভাবে হওয়া যায় তার হদিশ, বিভিন্ন যুব সংগঠনের হাল-হকিকৎ ইত্যাদি। এছাড়া পাবেন ভবিষ্যতে চাকরি পেতে গেলে কোন ধরনের পড়াশুনা আপনি করবেন বা কী ধরনের প্রশিক্ষণ নেবেন, তার খবরও। এক কথায় আজকের যুবক-যুবতীদের সামনে এই বিভাগ পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করবে।

চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সাধারণ জ্ঞান

প্রশ্ন

১. নিম্নোক্তদের মধ্যে আলাউদ্দিন খিলজির বিখ্যাত সেনাপতি কে ছিলেন?

ক. কুতুলঘ খাজা খ. জাফর খান গ. গাজি তুঘলঘ ঘ. মালিক কাফুর।

২. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই প্রধান প্রতিনিধির নাম কী, যিনি ১৯১৬ সালে মুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী করাবার জন্য লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন?

৩. রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন কে?

৪. পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি চাল উৎপাদন করে কোন রাষ্ট্র?

৫. কত সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়?

৬. প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ কত সালে কার কার মধ্যে হয়?

৭. এন আই পি এফ পি—পুরো কথাটি কী?

৮. ১৯৮৬ সাল থেকে তিন বছরের জন্য জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারম্যান কে হলেন?

৯. ভারতের প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান কে?

১০. পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি সোনা উৎপাদন করে কোন দেশ?

১১. পৃথিবীর সব থেকে পুরনো খেলা কোনটি?

উত্তর

১. জাফর খান। ২. বাল গঙ্গাধর তিলক। ৩. মার্কোনি। ৪. চীন। ৫. ১৯১১। ৬. ১৫২৬ সালে। বাবর এবং ইব্রাহিম লোদির মধ্যে। ৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স এণ্ড পলিসি। ৮. জিম্বাবোয়ের প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবে। ৯. প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। ১০. দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র। ১১. 'পোলো'।

জানতে চাই

সজল ঘোষ
হেমন্ত বসন্তের মানস কানন,
বারুইপুর / ২৪ পরগণা

জানতে চেয়েছেন বিমানের পাইলট বা চালক হতে গেলে কী করতে হবে। কোথা থেকে বিমান চালান শেখা যায়। আপনি উল্লেখ করেছেন এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানর সঙ্গতি আপনার পরিবারের আছে।

প্রথমেই আপনাকে জানাই যে, 'পাইলটিং' একটি কঠিন পেশা। এর ঝুঁকি অনেক। বিমান চালনাকে পেশা হিসেবে নিতে গেলে আপনাকে লাইসেন্সধারী হতে হবে। লাইসেন্সটি হল কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স। ১৮ বছর ঊর্ধ্বে'র যে কোন প্রার্থীকেই এই লাইসেন্স দেওয়া হয়। ইংরেজিতে আপনার ভাল জ্ঞান থাকা চাই। অবশ্যই বিমানচালক হতে গেলে উচ্চ-ডিগ্রীধারী হতেই হবে তার কোন মানে নেই। একজন বিমানচালক মাধ্যমিক উত্তীর্ণও হতে পারেন। অবশ্য তাঁকে বিজ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

ভারতে বিমান চালনা শিক্ষা দেবার কোন নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যে সেখান থেকে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স পাওয়া যাবে। সারা ভারতে মোট ২৪টি ফ্লাইং ক্লাব থেকে প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই সব ক্লাবের সারা ক্লাবে বিমান চালনা শেখেন। এই ক্লাবগুলি নিম্নোক্ত স্থানে আছে: অমৃতসর, বাঙ্গালোর, বরোদা, ভুবনেশ্বর, বোম্বে, কলকাতা, কোয়েম্বাটোর, হিসার, হায়দরাবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, জামশেদপুর, জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট, কার্নাল, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, নাগপুর, নয়া দিল্লি, পাতিয়ালা, পাটনা, রায়পুর, ত্রিবান্দ্রম, গুয়াহাটি এবং রাজস্থানের বনস্থলি বিদ্যাপীঠ।

এই সব ক্লাবের সদস্য হয়ে বিমান চালনা শিক্ষা নেবার আগে দরকার 'স্টুডেন্ট'স পাইলট লাইসেন্স।' অর্থাৎ ছাত্র হবারও লাইসেন্স চাই। এর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। বিমান চালনার ছাত্র লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হয় এয়ারো ক্লাব অব ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং, ৩য় তল, এফ ব্লক, কনট প্লেস, নয়া দিল্লি। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই বয়সের প্রমাণ, মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে হবে। এ সবই দিতে হয় এয়ারক্র্যাফট আইনানুযায়ী (Vide Section B of Schedule 11 of Aircraft Rules)।

মৌখিক ইন্টারভিউর পর আবেদনকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে ভারতীয় বিমানবাহিনীর মেডিকেল বোর্ড। দিল্লি ও বাঙ্গালোরে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়, তারা পরীক্ষা নিয়ে স্বাস্থ্যের দিক থেকে আবেদনকারী সুস্থ এই মর্মে ঘোষণা করলেই তবে একজন বিমান চালনা শেখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিমান চালনায় চোখ ও কান সজাগ রাখতে হয়। তাই এই দুটি অঙ্গ নিখুঁত থাকা চাই।

৪০ ঘণ্টা আকাশে ওড়বার পর একজন চালককে প্রাইভেট পাইলট'স লাইসেন্স দেওয়া হয়। আর ২০০ ঘণ্টা আকাশে ওড়ার পর দেওয়া হয় কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স পাবার পর একজন বিমানচালক ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, এয়ার ইণ্ডিয়া বা অন্য যে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারেন।

খরচ: মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যারা তাদের জন্য লাগে ২৫ টাকা প্রতি ঘণ্টা আকাশে ওড়ার জন্য।

অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা প্রতি ঘণ্টা ওড়ার জন্য।

বিমানচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় উপকরণের দামের সঙ্গে এই খরচের মাত্রারও অবশ্য তারতম্য ঘটে।

চিঠি লিখুন

আপনি কি মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে দীর্ঘদিন চাকরির খোঁজে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়েছেন? বর্তমানে স্বাধীন ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন? বা তাতেও হতাশ হয়েছেন? না, হতাশ হবার কোন কারণ নেই। কতখানি এগিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন অথবা ভবিষ্যতে কী ধরনের ব্যবসা করতে চান? কোন ধরনের চাকরি আপনার পছন্দ—পরিবর্তন-এর যুব দপ্তরে চিঠিপত্র বিভাগে লিখে সেসব জানান। আমরা আপনার বহু আকাঙ্ক্ষিত পথের হদিশ দেব। ঠিকানা:

পরিবর্তন যুব দপ্তর
চিঠিপত্র বিভাগ
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৬৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২

টুকরো খবর

তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতিদের জন্য শুভ সংবাদ

তপসিলি জাতি ও তপসিলি

উপজাতি চাকরি-প্রার্থীদের সরকার পরিচালিত কোন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার 'ফি' আর দিতে হবে না। ঐ ধরনের প্রার্থীদের সাধারণ 'ফি'-র এক-চতুর্থাংশ দিতে হত। তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৩০ জুন ১৯৮৫-র পর সরকারি কর্ম-সংস্থানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার যেসব বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তার থেকে ঐ প্রার্থীদের আর কোন ফি লাগবে না।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য

প্রচুর যুবক-যুবতী বি এ, এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাদের প্রচুর সমস্যার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঠিক মতন বেতন পান না। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে যাঁরা শিক্ষকতা করতে যান তাঁরা বাসস্থান পান না. চিকিৎসার সুবিধে নেই—ইত্যাদি সমস্ত সমস্যা নিয়ে শিক্ষকদের জন্য যে দুটি কমিশন সরকার নিয়োগ করেছিল সেই কমিশন দুটি শিক্ষকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করেছে। সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা হবে বলে ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী কে সি পন্থ রাজ্যসভায় জানিয়েছিলেন। এই সব সুপারিশ কিছু কিছু তুলে দেওয়া হল :

১ আগামী সপ্তম পরিকল্পনায় বিদ্যালয় শিক্ষিকাদের জন্য গ্রামাঞ্চলে ১ লক্ষ বাসস্থান নির্মাণে টাকা রাখা হবে।

২. বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণে 'হাউসিং ফাণ্ড' তৈরি করা হবে। সহজ শর্তে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ পাবেন।

৩. বেতনের বেসিক পে-র শতকরা ৭·৫ ভাগ চিকিৎসা খাতে প্রতি মাসে দেওয়া হবে। এছাড়া কঠিন রোগের চিকিৎসার সম্পূর্ণ হাসপাতাল খরচ এবং শিক্ষিকাদের সন্তান হবার সময় চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের গাড়ি, স্কুটার বা মোটর সাইকেল কেনার ঋণ পাবেন।

৫. পদের সৃষ্টি করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে আরও কিছু উচ্চ শিক্ষক শিক্ষিকা পদ রাখার ব্যবস্থা হবে।

ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয়

গত লোকসভা অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয় বিল অনুমোদন পেয়েছে। ভারতে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম। জাতীয় স্তরের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে তাঁদেরকে যাঁরা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি নিতে পারেন না অথচ নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে চান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি-বিদ্যার শিক্ষাও দেওয়া হবে। যাঁরা 'করেসপণ্ডেন্স কোর্সে'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা নেন তাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে পারবেন। রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, অডিও ক্যাসেট কী করে বানাতে হয় তা শেখান হবে এবং বিভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণ বানানর শিক্ষাও এখানে দেওয়া হবে। স্কুল কলেজে পড়তে পারেন না এমন দুর্বলতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর শিল্প বা কর্মসংস্থানের শিক্ষাও দেবে।

ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হন

সাধারণত ইন্টারমিডিয়েট বা দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর সকলেই ভাবেন এরপর কী করব? পড়াশুনা চালিয়ে যাব না কি কোন চাকরির খোঁজখবর নেব? আবার অনেকে ভাবেন, ধুৎ, বি এ, বি কম বা বি এসসি পড়ে কী হবে? শুধু শুধু সময় নষ্ট। তার থেকে কোন প্রশিক্ষণ নিতে থাকি বা চাকরিভিত্তিক পড়া-শুনা চালাই। যারা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, অনেক কষ্টে দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ তাদের চিন্তা, এবার যেকোন একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে সংসারটা বাঁচে। পরে রাতের দিকে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা শেষ করব।

যারা দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে একটা কাজের জন্য ঘুরছেন, পড়া-শুনা করার আর তেমন ইচ্ছে নেই, প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দিয়ে বা ইন্টারভিউ দিয়ে একটা চাকরি যাদের চাইই, এই সংখ্যার খবর তাদের জন্য। তবে এগুলো সাধারণত প্রশিক্ষণমূলক। আগামী সংখ্যায় আমরা দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া ছেলেমেয়েদের চাকরিভিত্তিক শিক্ষার খবর দেব।

ভারতীয় নৌবাহিনী

ইন্টারমিডিয়েট বা ১২ শ্রেণী (বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ হওয়া ছেলেদের জন্য নৌবাহিনীর কমিশন পদ খোলা আছে। তবে বয়স অবশ্যই ১৭ থেকে ২০-র মধ্যে হওয়া চাই। যাঁরা এন সি সি-র সি সার্টিফিকেট (নেভাল উইং) পেয়েছেন তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। অবশ্যই প্রার্থীদের ডিফেন্স সার্ভিস সিলেক-শন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন ইউ পি এস সি। বছরের মে-জুন মাসে সাধারণত পরীক্ষা হয়।

সীমান্ত-রক্ষা বাহিনী

ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ-মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছেলেদের সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টর পদে নেওয়া হয়। যে সব খেলোয়াড় হকি, ক্রিকেট বা যেকোনও ক্রীড়ায় নিজের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা শিথিল করা হয়ে থাকে। যাঁরা এন সি সি-তে অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১৮ থেকে ২৩ বছরের ছেলেরা আবেদন করতে পারেন, তবে তপসিলি জাতি বা তপসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে বয়সের সীমায় পাঁচ বছর ছাড় আছে।

এই চাকরির ক্ষেত্রে দৈহিক বিষয়ে আবশ্যিক হল : উচ্চতা হওয়া চাই ১৬৭ সেন্টি-মিটার। বুক (না ফুলিয়ে) ৮১ সেন্টিমিটার, ফুলিয়ে ৮৬ সেঃ মি। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ৫ সেন্টিমিটার ছাড় দেওয়া হয়। যে সব প্রার্থীর বয়স ২০ বছরের নিচে তাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ও বুকের মাপ ২·৫ সেন্টিমিটার ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নোক্ত

ঠিকানায় পত্র-মারফত যোগাযোগ করুন :

ডাইরক্টরেট জেনারেল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স, সর্দার প্যাটেল ভবন, নয়া দিল্লি ১১০ ০০১।

স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ

ভারতীয় রেলের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার পদে শিক্ষানবীশ হিসেবে ইণ্টারমিডিয়েট, উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেদের নেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্যই তাদের শিক্ষা বিষয়ে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক-র একটি থাকা চাই। বয়স ১৬ থেকে ১৯ বছর। তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপ-জাতিদের ৫ বছরের ছাড় আছে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষা সাধারণত বছরের মে-জুন মাসে হয়। আবেদনপত্র পাওয়া যায় সচিব, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, শাহজাহান রোড, নয়া দিল্লি ঠিকানায়।

পরীক্ষার বিষয়গুলি হল : ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, বীজগণিত, সাধারণ জ্যামিতি, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি।

স্পেশাল ক্লাস অ্যাপ্রেণ্টিসশিপে যাঁরা যোগ্য বলে নির্ধারিত হবেন তাঁদের সরকারের সঙ্গে চুক্তি-বদ্ধ হতে হবে যে, ট্রেনিং শেষে ভারতীয় রেলেই তাঁরা চাকরি করতে বাধ্য থাকবেন।

অর্ডনান্স ফ্যাকটরি অ্যাপ্রেনটিসশিপ

যারা উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের অর্ডনান্স ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং পদে ট্রেনি হিসেবে নেওয়া হয়। ট্রেনিং-এর সময় চার বছর। প্রার্থীদের বয়স ২০ বছরের নিচে হওয়া চাই। ট্রেনিং-এ কৃতকার্য হলে ট্রেনিদের স্থায়ী পদে নেওয়া হয়।

স্নাতকদের জন্য প্রতিযোগিতা-মূলক কাজের খবর

কম্বাইণ্ড ডিফেন্স সার্ভিস একজামিনেশন ৪ মে ১৯৮৬। নৌবাহিনীতে ৮০টি শূন্য পদের জন্য। (একজিকিউটিভ শাখায় নেভাল এভিয়েশন ও জেনারেল সার্ভিসে)। আবেদন করার শেষ দিন—১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫। (ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য) এবং

৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৫ (ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য)।

আপনাকে হতে হবে :

১. অবিবাহিত ভারতীয় নাগরিক।

২. বয়স ১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে (জন্ম হয়েছে ২ জানুয়ারি ৬৫ থেকে ১ জানুয়ারি ৬৮-র মধ্যে)।

৩. কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

কী করে আবেদন করবেন :

আবেদনপত্র পাবেন—সচিব, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর কাছে। ঠিকানা : শাহজাহান রোড, নয়া দিল্লি ১১০ ০১১। ২ টাকা মনিঅর্ডার বা ক্রস পোস্টাল অর্ডার করে পাঠিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় :

১. ৮০টি শূন্য পদের (৩২টি নেভাল এভিয়েশন পদ নিয়ে) ৬টি এন সি সি-র সি সার্টিফিকেট (নেভাল উইং) প্রাপকদের জন্য রক্ষিত।

২. যাঁরা স্নাতক পাঠক্রমের চূড়ান্ত বছরের ছাত্র তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। তবে তাঁদের ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬-র মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে।

৩. আবেদনপত্রে উল্লেখ করুন : 'Naval Academy' (Naval Aviation/General service) as my first choice।'

'নেভি' আপনাকে যে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে :

ক্যাডেটদের শিক্ষানবীশ থাকাকালীন বিনা পয়সায় থাকা, খাওয়া এবং চিকিৎসার সুযোগ। কমিশন পদে উত্তীর্ণ হলে আপনি হচ্ছেন 'অ্যাকটিং সাবলেফটেনেণ্ট।' মাসিক বেতন প্রায় ২,০০০ টাকা। (জেনারেল সার্ভিসে)। নেভাল এভিয়েশনে মাসিক বেতন প্রায় ২,৭২৫ টাকা। তখন বিনা পয়সায় রেশন ও থাকার সুবিধা। এছাড়া বীমার ও বিভিন্ন ভাতার সুযোগও রয়েছে।

ইউ পি এস সি পরিচালিত একটি লিখিত পরীক্ষা আপনাকে দিতে হবে। আবশ্যিক বিষয় :

ইংরেজি—১০০ নম্বর, সাধারণ জ্ঞান—১০০ নম্বর।

ঐচ্ছিক : অঙ্ক অথবা ফিজিক্স ১০০ নম্বর।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ইণ্টারভিউ দিতে হতে পারে। তাছাড়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রত্যেক প্রার্থীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

তরুণ প্রতিভা



পরিতোষ রায়। ফটো : লেখক

পরিতোষ রায়

দোতারাকে সঙ্গী করে কিছুকাল আগে লণ্ডন থেকে অনুষ্ঠান করে ফিরলেন পরিতোষ রায়। বিদেশ সফর এই প্রথম নয়। এর আগেও অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন আমেরিকা, হংকং, টোকিও, লণ্ডন এবং কানাডাতে। দোতারা ছাড়াও তিনি বাজাতে পারেন একতারা, ম্যাণ্ডোলিন ও ব্যাঞ্জো।

যখন তাঁর বয়স বারো, তখন এক ভদ্রলোক দোতারা নিয়ে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে। তাঁর কাছ থেকে দোতারাটি কিনে নিয়ে শুরু করেন শেখা। এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষক ফণীভূষণ ভট্টাচার্য।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে যে রেকর্ডটি বেরিয়েছে তার গান তিনটি পরিতোষ রায়ের লেখা।

মুকুল মুখার্জি

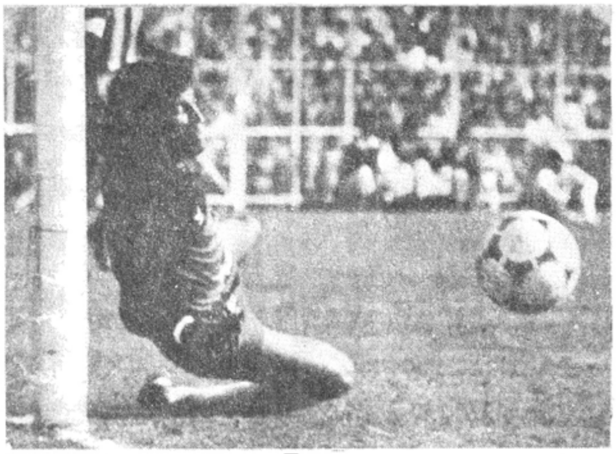
১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনের বাঙালি উৎসবে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মুকুল মুখার্জি। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রকৃত শিক্ষা তিনি পেয়েছেন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। গত বছরও তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে।

পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে তিনি বিশেষ পরিচিত নন। অথচ লণ্ডনে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন



মুকুল মুখার্জি । ফটো : লেখক সংগৃহীত

অনেকেই। সুচিত্রা মিত্র তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। এছাড়া ভাল লাগে আমজাদ আলি খাঁর সরোদ এবং অজয় চক্রবর্তীর গান। চটুল গান কোন সময়েই তাঁর মনে দাগ কাটে না।



অতনু ভট্টাচার্য । ফটো : অচিন্ত্য রায়

অতনু ভট্টাচার্য

ভারতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক অতনু ভট্টাচার্য ভারতকে এনে দিয়েছেন এক দুর্লভ সম্মান। 'এশিয়ান অল স্টার' দলে নির্বাচিত হয়েছেন অতনু। ২৫ বছর বয়স্ক এই কৃতী ফুটবলারের জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা এটিই।

পিটার থঙ্গরাজ এবং প্রতাপ ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই ফুটবলারের ফুটবলের প্রতি মোহ ছোটবেলা থেকেই। বাবা উমাকান্ত ভট্টাচার্য নিজেও ফুটবল খেলতেন। এরিয়ান, ভবানীপুর প্রভৃতি দলের খেলোয়াড় ছিলেন তিনি।

১৯৭৮ সালে হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে প্রথম গড়ের মাঠে খেলা শুরু করেন। ভারতীয় দলের হয়ে খেলছেন ১৯৮১ সাল থেকে। চীনে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের খেলাটিই এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে স্মরণীয় খেলা।

'দেশের' জন্যে আরও যেন খেলতে পারি।'—দেশের সম্মানরক্ষায় কৃত-সঙ্কল্প অতনু বিনয়ের সঙ্গে একথা বললেন।

সুতনু মুন্সী

আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানে সামরিক শাসন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে

জেনারেল জিয়া-উল-হক জাতীয় পরিষদে দলহীন নির্বাচনের ডাক দেবার সময় যে হিসাব করেছিলেন, তাঁর সে সময়কার সব হিসাবই ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

৮৪-র ডিসেম্বরে জিয়া সব দিক থেকেই সন্দেহজনক এক গণভোটে জিতে ভেবেছিলেন, এইভাবেই দলহীন নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নমনীয় জাতীয় পরিষদ গঠন করতে পারবেন, এবং এই জাতীয় পরিষদই তাঁর সামরিক শাসনকে চূড়ান্ত বৈধতা দিয়ে নিশ্চিত করতে পারবে।

জিয়া ভেবেছিলেন, জাতীয় পরিষদ এমন নতুন সাংবিধানিক কাঠামো আরোপ করার কাজে লাগবে, যা কিনা দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে স্থায়ী কর্তৃত্ব দেবে। তাঁর ১৯৮৩-র ১১ আগস্ট পরিকল্পনায় বস্তুত এরকম একটি ব্যবস্থা বিবেচনা করে দেখা হয়েছিল।

মুভমেন্ট ফর রেস্টোরেশন অব ডেমোক্রাসি (এম আর ডি) অর্থাৎ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্দোলন-এর ৯-দলীয় বিরোধী মোর্চা ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বয়কট করেছিল। বিরোধী মোর্চার নেতাদের এই বিশ্বাসে যথেষ্ট যুক্তি ছিল যে, তাঁরা যদি উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন তাহলে সেটা শুধু হত গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্দোলনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামরিক শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। কেন না যে জেনারেলের কোন ইচ্ছেই ছিল না অসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতাই থেকে যেতে সেই জেনারেলের হাতে।

তাছাড়া, প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা কতদূর সে ব্যাপারে সামরিক সরকার কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়নি। পরিষদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও জেনারেল জিয়া ইচ্ছাকৃতভাবেই একটা অস্পষ্টতা রেখেছিলেন। এমনকী অবাধ নির্বাচন, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি প্রশ্নেও সাংঘাতিক রকম [illegible] প্রথম থেকেই নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।

যাই হোক, জনগণের বিরাট একটা অংশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নামান হয়েছিল। এ'দের ভেতর অনেকেই ছিলেন ৯-দলীয় বিরোধী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ'রা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন।

এটা একটা অদ্ভুত নির্বাচন। প্রার্থীরা সকলেই নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁদের না ছিল কোন নির্বাচনী ইস্তেহার, না ছিল কোন রাজনৈতিক মঞ্চ। এমনকী, প্রার্থীরা এও জানতেন না যে, কী ধরনের জাতীয় পরিষদের জন্যে তাঁরা নির্বাচন চাইছেন এবং এই পরিষদের ক্ষমতাই বা কতটুকু। অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বী আইনত নির্ধাধিত সীমার বহুগুণ বেশি অর্থ খরচ করেছেন—জেনারেল জিয়া নিজে একথা স্বীকারও করেছেন। অবশ্য বেশির ভাগ নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল বেশ কম।

নির্বাচনী প্রচারে সব রকমের বাধা-নিষেধ সত্ত্বেওফলাফলটা কিন্তু জেনারেলদের কাছে একটা আঘাত হিসাবে এসেছিল। সামরিক প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সমর্থকরা অধিকাংশই হেরে গিয়েছিলেন। জিয়ার বরাবরের সমর্থক দক্ষিণপন্থী জামাত-ই ইসলামির প্রার্থীরাও তাঁদের অন্যতম। নির্বাচনের সময় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ এ'দের প্রতি সহানুভূতি গোপনও করেননি। কর্তৃপক্ষ সমর্থকদের জেতানর জন্যে বিধিবহির্ভূত সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

জাতীয় পরিষদের সদস্যদের কারোর প্রশ্নের জবাব দেবার কোন দায় নেই, তাঁরা কোন নীতি বা কার্যসূচির ব্যাপারেও অঙ্গীকারবদ্ধ নন। তাঁদের বেশির ভাগই ভোটদাতাদের কাছে বলেছিলেন সামরিক শাসন তুলে নেওয়ার এবং ১৯৭৩-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁরা কাজ করবেন। জাতীয় পরিষদ যে এ [illegible] দুটোর কোনটাই পারে না, এর থেকে বোঝা যায় পরিষদ কতটা অক্ষম। প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ খান জুনেজো বলে আসছেন, কয়েক মাসের মধ্যেই সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু জেনারেল জিয়া এ ব্যাপারে আপাতত কোন সিদ্ধান্তের কথা কিছু বলছেন না।

ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের অব্যবহিত পরই ১৯৭৩-এর সংবিধানটি সাংঘাতিকভাবে সংশোধন করা হয়। নতুন সাংবিধানিক কাঠামো সুপারিশ করার দায়িত্ব দিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তান পিপলস পার্টির সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন গভর্নর আসলাম খত্তাকের নেতৃত্বে ২৯ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করলেন জুনেজো। তিনি জানালেন, সুপারিশ পেলে সামরিক শাসন তুলে দেওয়া হবে। খত্তাককে পনের দিনের মধ্যে সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়েছিল, পরে অবশ্য সে সময়-সীমা বাড়িয়ে করা হয় জুলাই-এর শেষ সপ্তাহ।

গত কয়েক মাসের জাতীয় পরিষদ প্রতীয়মান করেছে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিজস্ব একটা লজিক আছে। সামরিক শাসনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সম্ভব নয়—তা সে রিগিং-এর মাত্রা যাই হোক না কেন। তাছাড়া, পরিষদের ভেতরে এবং বাইরে রাজনৈতিক দল না থাকলে পরিষদ চালান যায় না। ফলে দল তৈরির চেষ্টা হতে লাগল। প্রধানমন্ত্রী জুনেজো জাতীয় পরিষদের ২৩৭ জন সদস্যের ১৯০ জনকে নিয়ে একটি দল গঠন করে ফেললেন!

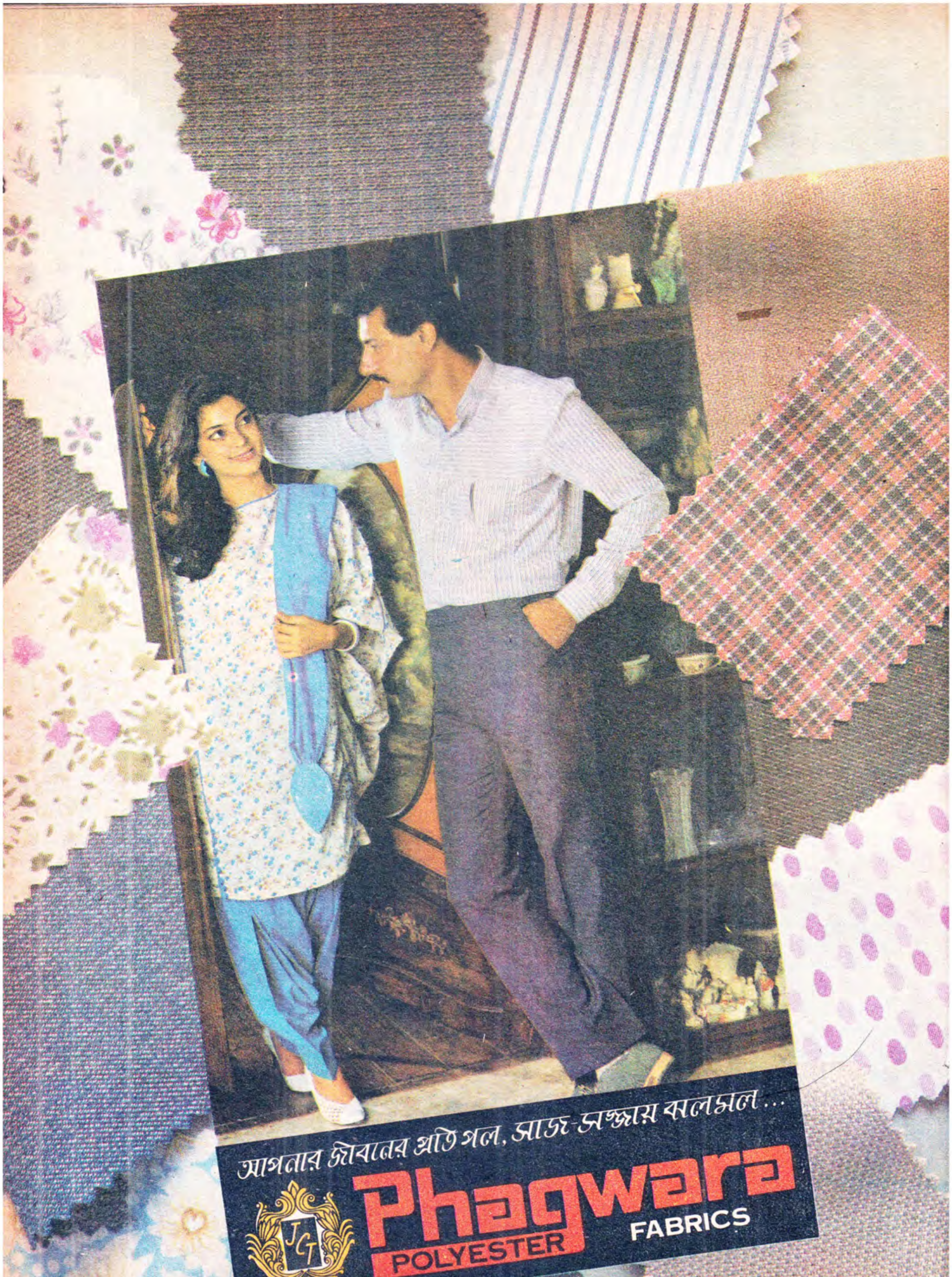
রাজনৈতিক দল গঠন করা সহজ নয়। কেন না এখানে একটা নৈতিক ব্যাপার এসে যাচ্ছে। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় বসার পর থেকেই গত আট বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে বলে আসছেন। তিনি বারবার রাজনৈতিক দলগুলিকে ইসলাম-বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। সেক্ষেত্রে জিয়ার নিজের দ্বারা গঠিত কোন রাজনৈতিক দল কী করে ইসলামিক হতে পারে?

দ্বিতীয় অসুবিধে হল: একটা রাজনৈতিক দলকে কাজ করতে দিলে, নিষিদ্ধ নয় এমন দলগুলোকেও কাজ করতে দিতে হবে। এটা সকলেই জানেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে বাধা-নিষেধ একবার তুলে নিলে এম আর ডি-র বিরুদ্ধে জেনারেল জিয়ার দলের কোনই ভবিষ্যৎ নেই। যদি তাই ঘটে, তাহলে বর্তমান জাতীয় পরিষদের আর কোন বৈধতা থাকবে না এবং আবার নতুন করে নির্বাচন ডাকতে হবে।

জাতীয় পরিষদের বর্তমান সদস্যরা এটা বেশ ভাল করেই জানেন। অনেক টাকা খরচ করে, কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাঁরা পরিষদে এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে সরাসরি বাধাহীন নির্বাচনে এম আর ডি-র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবেন না। অতএব বর্তমান জাতীয় পরিষদ সামরিক শাসন তুলে দেওয়া এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী নয়—যদিও নির্বাচনের সময় সদস্যরা এ ব্যাপারে সব রকম অঙ্গীকারই করেছিলেন। তার চেয়ে তাঁরা বরং জেনারেল জিয়াকেই সমর্থন করে যাবেন।

এদিকে জেনারেল জিয়া চাইছেন, জাতীয় পরিষদ তাঁর সামরিক সরকারকে জনপ্রিয় ও বৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা দানের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করুক এবং বর্তমান স্থিতাবস্থা সমর্থন করুক। বেতন এবং সুযোগ সুবিধা ছাড়া জাতীয় পরিষদের প্রতিটি সদস্যের নামে, তাঁর নিজস্ব নির্বাচন কেন্দ্রের আমোদ প্রমোদে ও কাজ কর্মে ব্যয় করার জন্য ১ লাখ ১০ হাজার করে টাকা জমা রাখা হয়েছে।

এম আর ডি নামে রাজনৈতিক বিরোধী মোর্চারও নিজস্ব কিছু অসুবিধে আছে। শরিক দলগুলির অধিকাংশই যথেষ্ট অপদস্থ হয়েছিল, যখন নিজ নিজ দলের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে তাদের নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু সদস্য জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিরোধী মোর্চার সবচেয়ে বড় ও নেতৃস্থানীয় শরিক পাকিস্তান পিপলস পার্টি গুরুতর অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। এর দুই প্রধান সদস্য মমতাজ ভুট্টো ও এ এইচ পিরজাদা সিন্ধ-বালচিস্তান-


আপনার জীবনের প্রতি পল, সাজ-সজ্জায় ঝলমল ...
JGT
Phagwara
POLYESTER
FABRICS

পুস্তুন ফ্রন্ট গঠন করেছেন। পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির বড় নির্বাচন কেন্দ্র পাঞ্জাবে এই ফ্রন্ট মতানৈক্য জোরদার করেছে। বেনজির ভুট্টো সিন্ধু প্রদেশের এই দুই নেতাকে বশে রাখতে পারছেন না।' এরকম একটি ফ্রন্ট গঠনের ফলে সামরিক আইনের বিরোধীরা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ছেন, এমনকী এতে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

পাঞ্জাবের জনগণ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছেন—এরকম একটা ধারণা বেশ ছড়িয়েছে .এবং এই ধারণার পেছনে যুক্তিও আছে। সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ--এই তিনটি ছোট রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পাঞ্জাবি অভিজাত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটা অবশ্য সামরিক প্রশাসনেরই অবদান। এছাড়া, এটা বিশ্বাস করা অবাস্তবোচিত হবে যে, পাঞ্জাবের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত এই তিনটি ছোট প্রদেশের মানুষ সামরিক একনায়কত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।

এম আর ডি-র ঐক্যের ব্যাপারে আরেকটা সমস্যা হল: মোর্চার কিছু নেতা শরিক দলগুলিকে বিলুপ্ত করে একটি দলে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। এই প্রস্তাব বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, কেননা পাকিস্তান পিপলস পার্টির কেউ কেউ এম আর ডি-র প্রকৃত চরিত্রটা ঠিক ধরতে পারছেন না। এম আর ডি হল আদর্শগত পার্থক্য বিশিষ্ট বিভিন্ন দলের একটি যুক্তফ্রন্ট, যারা শুধু একটি বিষয়েই ঐকমত্য পোষণ করে, আর তা হল সামরিক আইনের সমাপ্তি এবং গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

একবার উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে দলগুলি সম্ভবত আর ঐক্যবদ্ধ থাকবে না। তখন তারা নিজ নিজ পথ ধরেই চলবে। অতএব সন্ধিক্ষণে দলগুলির অস্তিত্ব বিলোপ করে একটি দলে পরিণত করার চেষ্টা বিপজ্জনক। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার-মার্শাল আসগার খাঁ এই প্রস্তাব যেভাবে বাতিল করে দিয়েছেন তাতেই মনে হয় এর ভঙ্গুরতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অন্তত দুটি দিক থেকে সামরিক সরকার তার স্থায়িত্বের ব্যাপারে আশঙ্কিত হচ্ছে। শিয়া সম্প্রদায়ের সশস্ত্র অনুগামীরা দাবি করছেন যে শুধুমাত্র শিয়া ধর্মমতেই প্রশাসনকে চলতে হবে। এতে সমস্যা হল: সরকার একবার যদি এই দাবি মেনে নেয়, তাহলে প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হবে যে, পাকিস্তানে দুটি 'ইসলাম'-এর অস্তিত্ব রয়েছে। সংখ্যাগুরু সুন্নি ইসলাম এবং সংখ্যালঘু শিয়া ইসলাম। এর ফলে অন্য ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলিও তাদের দাবি সোচ্চার করার উৎসাহ পাবে। শিয়া আন্দোলন ব্যাপক শিয়া-সুন্নি বিবাদেরও সৃষ্টি করতে পারে। মুসলিম ধর্ম বহির্ভূত, এই ঘোষণা জারী করে আহমেদিয়াদের যেভাবে দাবিয়ে রাখা হয়েছে সামরিক শাসকদের পক্ষে শিয়া সম্প্রদায়কে সেভাবে দাবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আহমেদিয়াদের ওপর নিগ্রহ এখনও চলছে। সংবাদে প্রকাশ, অনেক আহমেদিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা ইসলামিক 'কলমা' বুকে লাগিয়ে প্রদর্শন করছিলেন। বিরোধী মোর্চার কয়েকজন নেতা আহমেদিয়াদের ওপর নিগ্রহের প্রতিবাদ করেছেন।

দ্বিতীয় বিপদটি হল: বেনজির ভুট্টোর পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন। লারকানায় কবর দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর ভাই শাহনওয়াজের মরদেহ সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। কিছুদিন আগে ফ্রান্সে সন্দেহজনক অবস্থায় শাহনওয়াজ মারা গেছেন।

এই সময় বেনজিরের পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন, পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রতি ও সামরিক শাসনের বিরোধীদের প্রতি জনগণের যে সহানুভূতি ছিল, তাকে বেশ জোরদার করে তুলেছে। ১৯৭৩-এর সংবিধান পুনর্বহাল এবং সামরিক আইন তুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী এম আর ডি আন্দোলন জেনারেল জিয়াকে অসুবিধেয় ফেলবে এবং জাতীয় পরিষদকে অসমর্থনযোগ্য করে তুলবে। বেনজিরের প্রত্যাবর্তন ও সম্ভাব্য গোলমালের কথা ভেবে সামরিক সরকার বিরোধী নেতাদের সেসময়ই গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছিল। মনে হয় পাকিস্তানে আগামী দিনগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হাঙ্গামা জোরদার হতে বাধ্য। □

কলিম বাহাদুর



আমেরিকার চিঠি

রাজীব গান্ধী নিউইয়র্কে এসে এবারও সাড়া ফেলেছেন

নিউ জার্সি থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

১৯৮৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দুবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এলেন। জুন মাসে ওয়াশিংটনে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি রেগানের আমন্ত্রণে। অক্টোবরে এলেন নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের (U.N.O.) চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্যে। ২২ অক্টোবর বাহামা থেকে 'এয়ার ইণ্ডিয়া'র ত্রিশূল' বিমানে নিউইয়র্কে কেনেডি বিমান বন্দরে সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন রাজীব।

১৬ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বাহামায় কমনওয়েলথ অধিবেশনে ৪৬টি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির চেয়ারম্যান হিসাবে রাজীবের উপস্থিতি এবং বক্তৃতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। ২১ অক্টোবরের ঐ অধিবেশনে ভারত উত্থাপিত **'Declaration on world order'** সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রিটোরিয়ার বর্ণবৈষম্য নীতির অবসান ঘটানর জন্যে, সেখানকার সরকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ বিষয়ে ভারতের দৃঢ় মনোভাব ও নীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন রাজীব।' এরপর তিনি কিউবার হাভানায় ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ শেষ করে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছান। নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থার জন্য নিউইয়র্ক শহরে সে সময় কর্মরত প্রতিটি পুলিশ এবং তাঁদের গাড়িগুলিকেও সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আসা রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে রাজীব ও সোনিয়া গান্ধী ওয়াল্ডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে রাষ্ট্রপুঞ্জের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

২৪ অক্টোবর সকালে রাষ্ট্রপুঞ্জে জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে রাজীবের বক্তৃতাই ছিল এ সফরের প্রধান কার্যসূচি। তবে তার আগে পর্যন্ত তিনি যে যে সভায় যোগ দিয়েছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি।

২২ অক্টোবর বিকালে রাষ্ট্রপুঞ্জের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে ছিল রাজীবের প্রথম বক্তৃতা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির প্রধানদের উদ্দেশে রাজীব ভারত সরকারের জোট নিরপেক্ষ নীতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার পক্ষে এবং সামরিক জোট বাঁধার বিরুদ্ধে বেশ কিছু স্পষ্ট কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য—'যে দেশগুলি শক্তিশালী দুটি রাষ্ট্রের কোন একটির সঙ্গে জোট বাঁধেনি, তারা ইদানীং ভীষণভাবে আক্রমণ, অনধিকার হস্তক্ষেপ এবং চাপের হুমকিতে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। পৃথিবীর পরিবেশ ক্রমশ ঐ শক্তিগুলির জোট-বাঁধা মনোভাবের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে এবং অসাম্যবাদের চাপে প্রভাবিত হচ্ছে। আমরা আমাদের স্বাধীনতা আর সাম্যবাদকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে বিশ্বাস করি এবং সেখানে অন্য কারোর কর্তৃত্ব করার চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে থাকি।' তিনি প্রকারান্তরে আমেরিকাকে লক্ষ্য করেই বলেন, 'ইদানীং রাষ্ট্রপুঞ্জ নিজেই সেই শক্তিশালী রাষ্ট্রের শিকার হয়ে উঠেছে। তারা এর নিয়ম নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করছে। তারাই রাষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন নীতির ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে অন্যভাবে তার ব্যাখ্যা করছে। যে শর্তে তারা রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে দায়বদ্ধ, সেটি অস্বীকারের চেষ্টা করছে। ঐ শক্তিশালী দেশগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে অক্ষমতার অভিযোগ এনেছে, অথচ এই অক্ষম অবস্থার জন্যে দায়ী তাদেরই কিছু কার্যকলাপ। ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জকে শক্তি যোগাবার জন্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরাও জানি, রাষ্ট্রপুঞ্জের ভুলভ্রান্তি কোথায় ঘটছে। কিন্তু জোট বেঁধে সরে দাঁড়ান মানে পৃথিবীকে আরও অরক্ষিত অবস্থার সামনে ঠেলে দেওয়া, যেখানে যে কোন দেশ ইচ্ছেমত তার শান্তি নষ্ট করার সুযোগ পাবে।' রাজীব বলেছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং তার কার্য নির্বাহক সংস্থাগুলি আশা, সুপরিবর্তন এবং মানুষের জন্যে মানুষের বিবেচনা, সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বৃহৎ দায়িত্ব পালন করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের জন্য, সর্বজনীন কোন গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ ভূমিকা আছে।

এরপর রাজীব রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ইকনমিক ও সোস্যাল কাউন্সিল চেম্বার'-এ যান। সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতি ও প্রতিকার কল্পে বিভিন্ন দেশগুলির ভূমিকা। এরপর বক্তৃতা দেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তার মাত্র ছ ঘণ্টা আগে কর্মীবৃন্দের দীর্ঘদিন-ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। তবে রাজীব বলেছিলেন, যদি তা না হত, তিনি কোনমতেই 'পিকেট লাইন' অতিক্রম করতেন না। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকশত অতিথিকে তিনি বলেন, ভারত আমেরিকা সম্বন্ধে যতখানি জানে, আমেরিকা সে তুলনায় ভারত সম্পর্কে অনেক কমই খবর রাখে। আজ তাদের জানার সময় এসেছে। দীর্ঘকাল বৃটিশ লেখক বা সমালোচকদের চোখ দিয়ে সারা পৃথিবী ভারতকে দেখার চেষ্টা করেছে। হয় রাজারাণী রূপকথার জগৎ নয় ধুলো নোংরা, অভাব দারিদ্র্যের দেশ—এই ছিল ভারত সম্পর্কে অর্ধসত্য চেতনা। অথচ ভারতের প্রকৃত পরিচয়, তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি দর্শন, এবং ইদানীং-কালের আধুনিক উন্নয়নকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে।…আফ্রিকার



রাজীবের সাইটে রেগান

দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির কর্তব্যও ছিল তাঁর বক্তৃতার অন্যতম বিষয়। এছাড়া বলেন, পাকিস্তানে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ভারতের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। আমেরিকা ও ভারত প্রসঙ্গে বলেন, বহু ক্ষেত্রেই উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে, বিশেষতঃ হাইটেকনলজি ও কৃষির উন্নতিতে আমেরিকা ভারতকে নানাভাবে সাহায্য করছে।

রাত ৯টার সময় রাজীব ও সোনিয়া উপস্থিত হলেন শেরাটন সেণ্টারে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব আমেরিকার উদ্যোগে আয়োজিত এই নৈশভোজ ও বক্তৃতা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম সন্ধ্যা সাতটা থেকে। কারণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাদের অনেক আগে থেকে লবিতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। পাসপোর্ট, অনুমতি-পত্র, সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর মিলিয়ে, দেহ তল্লাসীর পর আমাকে ঐ হোটেলের জর্জিয়ান বলরুমে যেতে দেওয়া হল। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর, স্যুপ শেষ করে মেইন কোর্স খাবার মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে সবাইকার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। একদল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের মাঝখান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও সোনিয়া নিজেদের নির্ধারিত আসনে এসে বসলেন। রাজীবকে খুব হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল, সোনিয়াকেও মোটামুটি উদ্বেগমুক্ত মনে হল। ওয়াশিংটনে তাঁকে আগেরবারে অনেক বেশি গম্ভীর এবং সন্ত্রস্ত মনে হয়েছিল। নিউইয়র্কে ঐ সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব আমেরিকার সদস্যরা, রাষ্ট্রপুঞ্জ ও ভারতীয় দূতাবাস এবং কনসাল অফিসের উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মীরা, নিউইয়র্কের ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল ও সাপ্তাহিক ভারতীয় পত্রিকার সাংবাদিকরা এবং নিউইয়র্ক, নিউ-জার্সি অঞ্চলের বিশিষ্ট কিছু ভারতীয় পরিবার। এই প্রতিবেদক ছাড়া বাঙালি বলতে ছিলেন আর মাত্র দুটি পরিবার। মোট বারোশোটি আসন সম্পূর্ণ ভর্তি ছিল। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত মার্টিন লুথর কিং জুনিয়রের স্ত্রী করেটা কিং এবং কয়েকজন মার্কিনী সেনেটার। ভিড়ের মধ্যে দেখলাম খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ খেতে বসেছেন বান্ধবী মার্কিন অভিনেত্রী লিনডা কাটারের সঙ্গে।

প্রাথমিক উত্তেজনা, ছবি তোলা, ভিডিও তোলার পর্ব শেষ হলে যে যার আসনে ফিরে গেলেন। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের নির্দেশ অনুযায়ী খুব কাছে থেকে রাজীবকে দেখার সুযোগ কেউই পাচ্ছিলেন না। অন্তত হাত কয়েক দূরত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, মার্কিন সেনেটরদের বক্তৃতার পরে করেটা কিং তাঁর বক্তব্য রাখলেন। বর্ণ-বৈষম্য এবং মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংস আন্দোলনই ছিল করেটার বক্তৃতার মূল অংশ। মহাত্মার জীবন-দর্শন কীভাবে তাঁর স্বামীকে এক সময় উদ্বুদ্ধ করেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর বর্ণ বৈষম্যের প্রতি প্রতিবাদমূলক আচরণ এবং সম্প্রতি বাহামায় রাজীব গান্ধীর ঐ একই কারণে প্রিটোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন কৃষ্ণাঙ্গী করেটা।

রাজীব গান্ধী ও সোনিয়ার সামনে উপস্থিত করা হল বিশাল, প্রায় পর্বত-প্রমাণ একটি কেক। ভারতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষ উপলক্ষে ঐ কেক কাটলেন গান্ধীদম্পতি। তারপর শেরাটনের মার্কিন বেয়ারাদের হাতে হাতে প্রতি টেবিলে পৌঁছে গেল কফি সহ সেই কেকের নির্দিষ্ট মাপের ভগ্নাবশেষ। আমরা মধুরেণ সমাপয়েৎ মনে রেখে তার সদ্ব্যবহার করলাম এবং নিস্তব্ধ ঘরে খুব সন্তর্পণে কফিতে চিনির চামচ নেড়ে রাজীব গান্ধীর বক্তৃতা শুনলাম।

প্রথমেই দেরিতে আসার জন্যে লজ্জা প্রকাশ করলেন এবং রসিকতা করে বললেন- 'ভারতীয়দের নৈশভোজের সময় তো খুব বাঁধাধরা থাকে না। শুরু হতেও দেরি, শেষ হতেও দেরি'…এইরকম ভেবে নিয়েই তিনি অন্যান্য মিটিংগুলো শেষ করে আসছিলেন। মার্কিন অভিবাসী ভারতীয়দের তিনি প্রকৃতপক্ষে ভারতের দূত বলে মনে করেন। তাঁদের আচার, আচরণ, জীবনযাপনের মান, ভারত সম্পর্কে মনোভাব যদি উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর বহন করে, তবেই বহির্বিশ্বে ভারত যথার্থভাবে প্রতিফলিত হবে। বলেন, 'আমি খবর নিয়ে জেনেছি, আমেরিকায় আপনারাই আর্থিক উপার্জন এবং পদমর্যাদায় সবচেয়ে ওপরের সারিতে আছেন। আপনারা ভারতের কৃতী সন্তান এবং আমাদের গর্ব। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, ভারতের প্রতি আপনাদের কর্তব্য এবং দায়িত্বকে মনে রাখবেন। আর্থিক লাভের প্রত্যাশা নিয়ে নয়, জন্মভূমির প্রতি কিছু ঋণ আছে মনে রেখে নিজেদের দেশে ফিরে আসার কথা ভেবে দেখুন…।' ক্রমশ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, উচ্চতর কলা-কৌশল ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রচেষ্টা, কৃষির উন্নতি, নতুন আয়কর ব্যবস্থা, কালো টাকার সদ্গতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বিশেষভাবে বলেন কংগ্রেসের সূচনা ও ভারতের রাজনীতিতে এই দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানের কথা। রাত ১১টার পরে আমরা যখন হোটেলের লবিতে নেমে আসি, তখন পুলিশ এবং তাদের সঙ্গে চেনে বাঁধা বড় বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর চতুর্দিক পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। হোটেলের সামনের রাস্তায় শুধু লাল আলো-জ্বলা পুলিশের গাড়ি। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের সারা এলাকা জুড়ে দেখা যাচ্ছে। একজন ভারতীয় দেহরক্ষী প্রায় রাজীব গান্ধীর পিঠের সঙ্গে মিশে থাকছিলেন প্রতিটি অনুষ্ঠানে। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি হোটেলের এলাকা ছাড়িয়ে ওয়াল্ডর্ফ অ্যাস্টোরিয়ার দিকে রওনা হবার পর, আমরা পার্কিং লটে বা রাস্তায় নামবার অনুমতি পেলাম।

২৩ অক্টোবর রাজীব নানা মিটিং-এ ব্যস্ত ছিলেন। সকালে ওয়াল্ডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে 'বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার' জন্যে মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার উদ্যোগে তাঁরই সুইটে ৩৫ মিনিটের জন্যে রাজীব আলোচনায় বসেন। প্রধান বিষয় ছিল উভয় রাষ্ট্রের সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা, সন্ত্রাসবাদী ও চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা, উভয় দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্কের উন্নতি এবং সর্বোপরি পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ প্রসঙ্গ। দুটি দেশই যে অস্ত্র নির্মাণের জন্যে নয়, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের উন্নতি প্রকল্পে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত, এই নিয়ে আলোচনা হয়। পরে রাজীব সাংবাদিকদের কাছে বলেন, 'পাকিস্তানের পরমাণু পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কথা বলেছি। জিয়া বলেছেন—তাঁরা নাকি পরমাণু শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করার কথা ভাবছেন না। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছি না। যাই হোক, আমাদের এক সঙ্গে চিন্তা করে দেখতে হবে কীভাবে ঐ শক্তিকে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে ব্যবহার করাতে সীমাবদ্ধ রাখা যায়।' জিয়া অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জে বক্তৃতা দেবার সময় জোর গলায় বলেছেন পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করতে বা সমঝোতায় আসতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে।

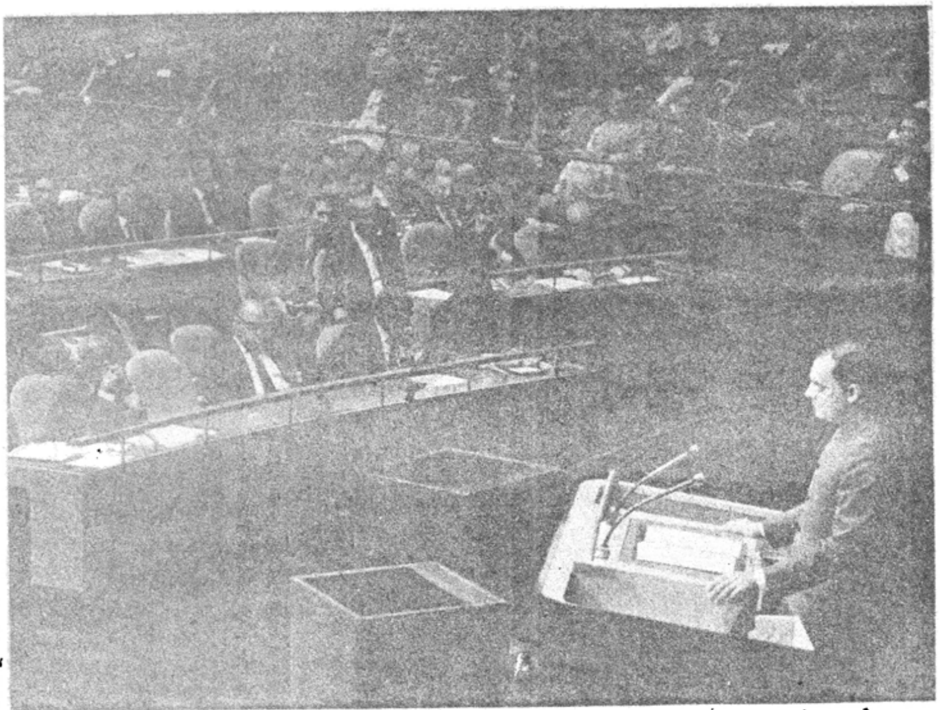
'ঐ দিন বিকেলে ওয়াল্ডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলেই রাষ্ট্রপতি রেগানের সঙ্গে রাজীব গান্ধী আধ ঘণ্টার জন্যে আলোচনায় বসেন। দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণ প্রসঙ্গ ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়। এছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষ থেকে সাধারণভাবে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন রাজীব। এবারের সাক্ষাতে বিশেষভাবে কোন ভারত-আমেরিকা ইস্যু প্রাধান্য পায়নি। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে– দুই দেশই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখায় কোন বিশেষ আলোচনার কারণ ঘটেনি।

২৩ অক্টোবর রাজীব পশ্চিম জার্মানী, চীন, নিকারাগুয়া ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গেও দেখা করেন। সেই সময়ে সোনিয়া গান্ধী 'এশিয়া সোসাইটি' ও মেট্রোপলিটন যাদুঘরে 'ভারত' প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন। রাত্রে রাজীব একা রাষ্ট্রপুঞ্জের নৈশ-ভোজে আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাদ্য তালিকায় ছিল আমেরিকার হিমশীতল গলদা চিংড়ি, গাজর ও এ্যাচোড় জাতীয় সবজি সহযোগে বাছুরের মাংস, স্যালাড এবং মণ্ট ব্ল্যাংক নামে এক বিশেষ ধরনের আইসক্রিম।

২৪ অক্টোবর রাজীব রাষ্ট্রপুঞ্জে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বক্তৃতা দেন। বিশ্বের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে, কোন দেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি

দিতে, কোথাও আসন্ন যুদ্ধকে রোধ করতে রাষ্ট্রপুঞ্জ সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপনিবেশ অধিকারের যুগ শেষ হয়নি। নামিবিয়া তার উদাহরণ। ২৫ বছর আগে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা করেছিল 'ফ্রিডম অব কলোনি', আর সাত বছর আগে সিকিউরিটি কাউন্সিল নামিবিয়ার স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সাত বছরের বঞ্চনা, সাত বছরের অজস্র রক্তপাত—অথচ আজও পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে নামিবিয়ার প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় সম-অধিকারের দাবি আজও স্বীকৃত হয়নি। বর্ণবৈষম্য, ঔপনিবেশিক মনোভাব অটুট রয়েছে। ভারতের মানুষ সেখানকার কালো মানুষগুলির সঙ্গে এক হয়ে অদৃশ্য বন্ধন বা সংযোগ অনুভব করেন। ঐ সেই দেশ, যেখানে মহাত্মা গান্ধী মানবিক অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন। লিও তলস্তয় বলেছিলেন, 'আমি একটি মানুষের পিঠে চড়ে বসে তার কণ্ঠরোধ করার উপক্রম করেছি। তার প্রতি আমার খুবই সহানুভূতি আছে, অথচ তার পিঠ থেকে আমি নামতে চাই না।'…

কবে কালো মানুষদের পিঠ থেকে বর্ণবৈষম্যের বোঝা নামানো হবে? সব রকমভাবে চাপ সৃষ্টি করা দরকার। সবরকম বাধ্যতামূলক নিষ্ঠুর নীতি প্রয়োগ করে প্রিটোরিয়া সরকারের এই অন্যায় বন্ধ করতে হবে…প্যালেস্টিনিয়ানদের নিজের দেশে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে না দিলে কোনদিন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসবে না। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যত কিছুই করা হয়নি। ইস্রায়েলের আক্রমণকে কোন রাজনৈতিক যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় না…। সন্ত্রাসবাদ চলছে। এ যুগে সন্ত্রাসবাদ আধুনিক অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে হিংসার খেলায় মেতে উঠেছে। চলছে মানুষের জীবন নিয়ে, বন্দী বিনিময়ের অজুহাত নিয়ে বর্বরের মত প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা। আন্তর্জাতিক আদেশ জারী করে এই হুমকি বন্ধ করা দরকার। মানুষ সারা জীবন ধরে অলিখিত কিছু আদেশ ও শৃঙ্খলাকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছে। সভ্যতা তাকে উন্নতি ও বিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।…'লিগ অব নেশনস' ছিল পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রকাশ্যমাধ্যম। তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।…রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম হয়েছিল ঐ উদ্দেশ্য এবং আরও অনেক মহৎ পরিকল্পনা নিয়ে। তার কিছু সফল হয়েছে, অনেক কিছুই হয়নি।…পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। একটি স্ফুলিঙ্গের সূত্রপাতের আশঙ্কায় সারা পৃথিবী আতঙ্কিত। ঐ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির প্রতি আমাদের আবেদন এই যে, শক্তির পরীক্ষায় নয়, সহ-অবস্থানেই পৃথিবীর শান্তি আসবে। নিরস্ত্রীকরণ কার্যকর হোক। গোর্বাচভ এবং রেগান-এর মধ্যে আসন্ন মিটিং ও আলোচনা সেই 'সম্ভাবনাকে' বাস্তব রূপ দিক। অস্ত্র সংবরণ, সন্ত্রাসবাদের অবসান, ঔপনিবেশিক শক্তির অপসারণ, বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ, প্রতিটি রাষ্ট্রের সমমর্যাদা, অনুন্নত দেশগুলির প্রয়োজনে আর্থিক আনুকূল্য দান—ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে রাজীব গান্ধী বক্তৃতা শেষ করেন।



রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দিচ্ছেন রাজীব

২৪ অক্টোবরই নিউইয়র্কের শিখ সম্প্রদায় রাজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জটিল পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। তাঁরা বলেন, 'আপনার এই মহৎ কার্য ইতিহাসে স্বীকৃত হবে। আমরা ভারতের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকব। হয়ত মতের বিভেদ হবে, তবু আমরা ভারতকে বিস্মৃত হব না। ভারতও যেন শিখ সন্তানদের বিস্মৃত না হয়। শহীদ লঙ্গোয়ালের মৃত্যু আমাদের প্রকৃত আঘাত দিয়েছে। পাঞ্জাব আবার সর্বক্ষেত্রে উন্নত রাজ্য হয়ে উঠুক। সে-ও তো ভারতেই উন্নতিসাধন। ভারতে 'ভারত ঐক্যবদ্ধ সপ্তাহ' পালন করা হোক। প্রতিটি রাজ্য যেন তার সম্মানে শপথ গ্রহণ করে।'

ঐদিন দুপুরে ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজীবের লাঞ্চ এবং সাক্ষাৎকার। সন্ধ্যায় 'ভারত উৎসব'-এর ব্যবস্থাপকরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

২৫ অক্টোবর রাজীব গান্ধী সস্ত্রীক নেদারল্যাণ্ডের পথে রওনা হয়ে যান। সেখান থেকে তাঁর মস্কো যাত্রা এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান মিখাইল গোর্বাচভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মার্কিন রাজনৈতিক মহলকে কিছু আশ্চর্য করেছে। কারণ এই সফরসূচির সম্ভাবনা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল।

জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে রাজীব গান্ধীর ভূমিকা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপুঞ্জে বক্তৃতার বিষয় নির্বাচনেও তিনি সময়োপযোগী বক্তব্য রেখেছেন। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রণসিংহে প্রেমদাস বলেছেন, 'রাজীব গান্ধী উপলব্ধি করেছেন, আজ যা অন্য দেশের বিভিন্ন কারণ হয়েছে আগামী কাল তা তাঁর দেশে বিপদ ডেকে আনতে পারে।' পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে 'এশিয়ান মেম্বার অব দ্য গ্রুপের' পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেবার সময় রাজীব গান্ধীকে বলেছেন, 'এক বছর আগে এক নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আপনি কার্যভার এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তা সত্ত্বেও জোট নিরপেক্ষ নীতি গুরুত্বপূর্ণভাবে অনুভব করে আপনি এরই মধ্যে যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং মনোভাব বজায় রেখেছেন তার জন্য আমরা এশিয় দেশগুলি গর্বিত বোধ করছি।'

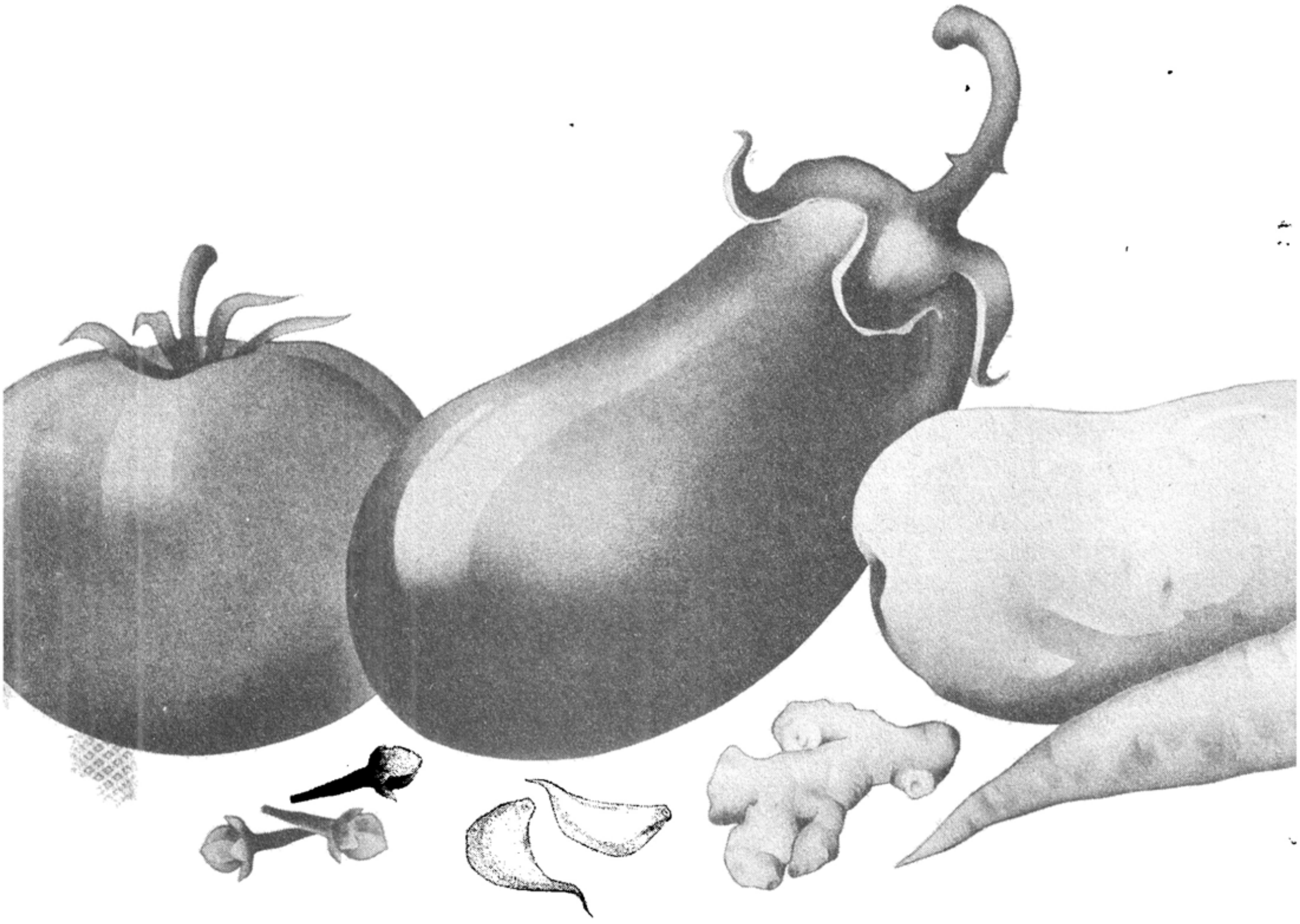
এখানকার ভারতীয় সমাজ রাজীব গান্ধী সম্পর্কে বেশ আশাবাদী হয়ে উঠছেন। মার্কিন সাংবাদিকরা তাঁকে মায়ের তুলনায় অনুত্তেজিত, ধীর মস্তিষ্কের মানুষ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের আপাতত বিচারে নমনীয় রাজীব একটি ছোট্ট ঘটনা কিন্তু অন্যরকম নজীর রেখে গেছেন। নিউইয়র্কের মেয়র এড কচ ভারত সফর বাতিল করে দেন, যেহেতু রাজীব গান্ধী রাষ্ট্রপুঞ্জে ইয়াসের আরাফতকে আমন্ত্রণ জানানর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জাতে ইহুদি এড কচ রাজীবের ঐ প্রস্তাব একেবারেই পছন্দ করেননি। রাজীব আমেরিকায় এলেন এবং নিউইয়র্কে মেয়রের বাড়ির নৈশভোজের আমন্ত্রণ সর্বপ্রথমেই বাতিল করে দিলেন। ☐

ফটো: অভিজিৎ মিত্র

উত্তরে তুষারাবৃত পর্বতমালা,
ক্ষণে তরঙ্গ-ধৌত সাগর বেলা ···
রত এক আশ্চর্য্য দেশ ! এ প্রান্ত থেকে
প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করলে
খবেন কত বিচিত্র প্রথা, খাবার
ার ভাষা।
ভ্রমণ করবার সময় প্রধানতঃ

যে সব ব্যাপার নিয়ে ভয় হয়, তার মধ্যে
একটি হল — আমরা যে খাবার
খেয়ে অভ্যস্ত, তা পাবো তো ? কিন্তু রোজ
বাড়ীতে যে খাবার খেয়ে থাকেন,
ভ্রমণ করতে বেরিয়েও যদি তাই খেতে হয়,
তাহলে আর ভ্রমণের মজা কি রইলো ?
ছুটিতে নিন —

এক রোমাঞ্চকর অভিযানের
সুযোগ ! প্রতিদিন খান — নতুন নতুন
স্বাদের খাবার ! গোয়াতে মুখে জল আনা
ভিন্দালু; বম্বেতে পার্সী ধানশাক;
প্রাচীর ঘেরা দিল্লী শহরে রেশম কাবাব;
বঙ্গদেশে 'মিষ্টি দই', আর দক্ষিণে
কাগজের মত পাতলা মচমচে ধোসা।



মা সঙ্গে না থাকলেও,
স্বাদ উপভোগ করে সারা

পরিমিত খাদ্যই মেদ কমানর একমাত্র ওষুধ

একথা এখন সকলেই জেনে গেছেন যে মেদ-বাহুল্য রক্তচাপ, এনজাইনা, করোনারি ও সেরিব্রাল থ্রোম্বোসিস, ডায়াবিটিস, গলস্টোনের জন্যে অনেকাংশে দায়ী, কিডনিতে নানান মারাত্মক অসুখও সৃষ্টি করে থাকে। অত্যধিক মেদের ভারে হার্নিয়া এবং নিম্নাঙ্গে আর-থ্রাইটিসও হতে পারে। দেখা গেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত শরীরের শতকরা ১০ ভাগ ওজন আয়ুর শতকরা ১৩ ভাগ কমিয়ে দেয়। আশ্চর্যের কথা, এত জ্ঞান সত্ত্বেও কিন্তু সমৃদ্ধ দেশগুলিতে দেখা যায় প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষই মেদ-বাহুল্যে ভুগছেন।

শরীরে মেদ বৃদ্ধি পায় কেন? প্রধানত কম পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত ভোজনের ফলে। জীবন ধারণের জন্য দৈনিক শরীরকে খাদ্যের মাধ্যমে যতটা 'ক্যালরি' বা 'তাপাঙ্ক' সরবরাহ করা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি ক্যালরি সরবরাহ করলেই তা জমে গিয়ে শরীরে মেদবৃদ্ধি করে। অবশ্যই আমাদের মধ্যে এমন অনেককেই দেখা যায়, যাঁরা অত্যধিক খেয়েও কিন্তু তেমন মোটা হন না। যাঁদের বিপাকীয় শক্তি এমন জোরদার যে, তাঁরা যা-ই খান না কেন, খাদ্যের মধ্যস্থিত ক্যালরির সবটাই তাঁদের শরীর কাজে লাগিয়ে ফেলে। সেই তাপাঙ্কের এমন একটুও অবশিষ্ট থাকে না যা জমে গিয়ে তাঁদের শরীরে মেদবৃদ্ধি করতে পারে। জেনে রাখা দরকার, যে ব্যক্তি মোটা হবেন তাঁর সে ভাগ্য কিন্তু নির্ধারিত হয়ে যায় তাঁর ছোটবেলাতেই। যাঁদের বাবা-মায়েরা চান প্রচুর খাইয়ে বাচ্চাদের নাদুসনুদুস করে তুলতে, তাদের পাকস্থলী ছোটবেলা থেকেই প্রশ্রয় পায় ঘন-ঘন প্রচুর খাবার হজম করার। যাঁরা বড় হয়ে আর কিছুতেই পরিমিত আহারে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না—যতক্ষণ না তাঁরা কোন বড় রোগের শিকার হচ্ছেন। দেখা গেছে, ছোট থেকেই যাঁরা মেদবহুল, তাঁরা অধিকাংশই অল্প বয়সেই নানান ব্যাধির শিকার হন।

বেশি খাওয়াই যখন মেদ-বাহুল্যের প্রধান কারণ, আসুন তাহলে এবার দেখা যাক আমাদের নিত্যকার কতটা কী খাওয়া উচিত

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণকে প্রকাশ করা হয় 'ক্যালরি'তে। ১ ক্যালরি মানে—ততটা উত্তাপ যা ১ গ্রাম জলের উত্তাপকে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উন্নীত করতে পারে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা কম পরিশ্রমী, যাঁদের বলা হয় Sedentary habit-এর মানুষ, যেমন গৃহবধূ, অফিস কর্মচারী, শিক্ষক, পড়ুয়া ইত্যাদি, নিত্য জীবন ধারণের জন্য সেই জাতীয় পুরুষদের প্রয়োজন—২,৪০০ ক্যালরি। যাতে প্রোটিন থাকবে ৫৫-৬০ গ্রাম। সিডেনটারি মহিলাদের প্রয়োজন ১,৯০০ ক্যালরি এবং প্রোটিন ৪৫-৫০ গ্রাম।

শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার জন্য—১,৫০০ ক্যা, নিত্যনৈমিত্তিক পরিশ্রমের জন্য ৪৪০ ক্যা., হাঁটাচলার জন্য ৩০০ ক্যা., ডেস্ক ওয়ার্কের জন্য—১৬০ ক্যা. = ২,৪০০ ক্যা.। অপরপক্ষে পরিশ্রমী পুরুষদের নিত্যপ্রয়োজন হয় ৩,৯০০ ক্যালরি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩,০০০।

নিশ্চয় অফিসকর্মী কী মহিলারা রাগ করছেন, ভাবছেন তাঁদের নিত্য ট্রাম বাস অফিসের ধকল এবং ঘরের রান্না-বান্না, কাচাকুচি, দোকান-পাট, বাচ্চাকে স্কুল নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসা ইত্যাদি কি তাহলে কোন পরিশ্রমই নয়? এর উত্তর মিলবে, কতটা পরিশ্রমে কী পরিমাণ ক্যালরি হজম হতে পারে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে। এক পিস মোটা পাঁউরুটি (১০০ ক্যা.) হজমের জন্য প্রয়োজন ৪ মাইল হাঁটার। তাহলে দেখুন, পরিশ্রম করে মেদ কমাতে চাইলে নিত্য যা খাই তার অন্তর্গত ক্যালরি ব্যবহার করতে ঠিক কতটা পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন! তাই ব্যায়াম করে মেদ কমানর চেয়ে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে মেদ কমান অনেক সহজ। তাছাড়া শুধু ব্যায়ামে মেদ নাও কমতে পারে, যদি না ব্যায়ামের পর খাদ্য গ্রহণকে করা হয় পরিমিত। ব্যায়াম যেহেতু খিদে বাড়ায়, তাই ব্যায়ামকারীদের খাদ্য গ্রহণে বাড়াবাড়ি হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত যাঁদের খাদ্যের ক্যালরি ও ব্যায়াম-আনুপাতিক খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে ধারণা নেই। কথাটা জানা নেই বলেই দেখা যায় মেদ কমাতে যাঁরা ব্যায়াম করছেন তাঁদের অধিকাংশই আর কিছুতেই রোগা হতে পারছেন না।

এবার দেখা যাক, আমাদের ২,৪০০ ক্যালরির মত খাদ্য এবং ৫৫-৬০ গ্রাম প্রোটিন পেতে রোজ ঠিক কতটা কী খাওয়া উচিত:

সারণি ১

১। চাল ২০০ গ্রাম। ৭০০ ক্যালরি, প্রোটিন ৬২ গ্রাম	৭। শাকসব্জি ১৫০ গ্রাম ৩৫ ক্যালরি
২। ময়দা—১০০ গ্রাম। ৩৫০ ক্যালরি, প্রোটিন ১২ গ্রাম	৮। গরুর দুধ—১০০ গ্রাম। ৬৫ ক্যালরি, প্রোটিন ৩.৫ গ্রাম
৩। ডাল—৫০ গ্রাম। ১৭৫ ক্যালরি, প্রোটিন ১০ গ্রাম	৯। হাঁসের ডিম—১টা। ৮৫ ক্যালরি, প্রোটিন ৬ গ্রাম
৪। পাঁউরুটি—৫০ গ্রাম। ১২৫ ক্যালরি, প্রোটিন ৪ গ্রাম	১০। মাছ-মাংস ১০০ গ্রাম। ১০০ ক্যালরি, প্রোটিন ২০ গ্রাম
৫। বিস্কুট—৪টে। (প্রতিটি ২৫ গ্রামের) ৯০ ক্যালরি, প্রোটিন ১ গ্রাম	১১। ফল—৫০ গ্রাম। ২৫ ক্যালরি, প্রোটিন ০ গ্রাম
৬। আলু—৭৫ গ্রাম। ৭২ ক্যালরি, প্রোটিন ০ গ্রাম	১২। চিনি ৪০ গ্রাম। ১৬০ ক্যালরি, প্রোটিন ০ গ্রাম
	১৩। তেল-ঘি—৩০ গ্রাম। ২৭০ ক্যালরি, প্রোটিন ০ গ্রাম

এবার দেখা যাক এইসব উপকরণ দিয়ে রোজকার একটা মেনু কেমন হতে পারে:

সারণি ২

ভোরে- চা (১ কাপ), বিস্কুট (২টো)	১০০ ক্যালরি, প্রোটিন ১ গ্রাম
প্রাতরাশ—মাখন টোস্ট (২), ডিম (১), কলা (১), চা (১ কাপ)	৪৬০ ক্যালরি, প্রোটিন ১১ গ্রাম
মধ্যাহ্ন ভোজন—ভাত, ডাল, সব্জি, মাছ, দই	৯৭০ ক্যালরি, প্রোটিন ২২ গ্রাম
বিকালে—চা (১ কাপ), বিস্কুট (২)	১০০ ক্যালরি, প্রোটিন ১ গ্রাম
নৈশভোজ—রুটি (৪টে), ডাল, মাছ মাংস, সব্জি / সেলাড, দুধ ১ কাপ	৭৫০ ক্যালরি, প্রোটিন ২৫ গ্রাম
মোট-	২,৩৮০ ক্যালরি প্রোটিন ৬০ গ্রাম

শিশু এবং কিশোরদেরও নিত্য কতটা ক্যালরি গ্রহণের প্রয়োজন সেটাও জানা দরকার। ১-৩ বছরের শিশুর প্রয়োজন—১,২০০ ক্যালরি এবং প্রোটিন ১৭-২০ গ্রাম। এই ক্যালরির প্রয়োজন মিটতে পারে, ভাত / রুটি—১৫০ গ্রাম, ডাল—৫০ গ্রাম, সব্জি—৭৫ গ্রাম, আলু ৫০ গ্রাম, ফল-৫০ গ্রাম, দুধ ২০০ গ্রাম, মাছ / মাংস / ডিম—৩০ গ্রাম। বাচ্চা শাকাহারী হলে মাছ / মাংসের বদলে তাকে দিতে হবে দুধ ২০০ গ্রামের উপর আরো ১০০ গ্রাম বেশি।

৪-৬ বছরের শিশুর প্রয়োজন ভাত / রুটি—২০০ গ্রাম, ডাল—৫০ গ্রাম, সব্জি—৭৫ গ্রাম, আলু-৭০ গ্রাম, ফল—৫০ গ্রাম, দুধ-২০০ গ্রাম, মাছ / মাংস / ডিম-৩০ গ্রাম, চিনি ৪০ গ্রাম ও তেল ঘি—২৫ গ্রাম।

৭-৯ বছরের শিশুর প্রয়োজন ভাত / রুটি ২৫০ গ্রাম, ডাল ৬০ গ্রাম, সব্জি ৭৫ গ্রাম, আলু ৫০ গ্রাম.

১০-১২ বছরের শিশুর প্রয়োজন ভাত / রুটি—৩২০ গ্রাম, ডাল—৬০ গ্রাম, সব্জি—১০০ গ্রাম, আলু—৭৫ গ্রাম, ফল—৫০ গ্রাম, দুধ—২০০ গ্রাম, মাছ / মাংস / ডিম—৩০ গ্রাম, চিনি ৫০ গ্রাম, তেল / ঘি—৩৫ গ্রাম।

দুধ ২০০ গ্রাম, মাছ / মাংস / ডিম ৩০ গ্রাম, তেল / ঘি ৩০ গ্রাম, চিনি ৫০ গ্রাম।

মনে রাখা দরকার, ৪০ উর্ধ্বে

খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৫ ভাগ (২,২৮০), ৫০ উর্ধ্বে—শতকরা ১০ ভাগ (২,১৬০), ৬০ উর্ধ্বে শতকরা ২০ ভাগ (১,৯২০ ক্যাঃ) এবং ৭০ উর্ধ্বে শতকরা ৩০ ভাগ (১,৬৮০ ক্যাঃ) কমে যায়।

কিন্তু সবার আর্থিক অবস্থা যেমন সমান নয়, সমান নয় সবার খাদ্যরুচিও। তাই রোজ একই মেনু ধরে খাওয়া একান্তই বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। সেই বিরক্তি এড়াতে তাই আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন নিত্য-ব্যবহার্য খাদ্যে কীসে কতটা ক্যালরি আছে। (সারণি-৩)

স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে নিজের উচ্চতা অনুসারে ওজন কতটা হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও সবারই একটা সঠিক ধারণা থাকা উচিত। গড়ন অনুসারে মানুষের দেহকে পাতলা, মাঝারি এবং ভারি বলে বর্ণনা করা হয়। মাঝারি গড়নের পুরুষ ও মহিলাদের উচ্চতা অনুসারে তার দেহের ওজন কতটা হওয়া উচিত তা দেওয়া হল সারণি ৪-এ।

মনে রাখার সুবিধার জন্য বলা যেতে পারে, একজন ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা মাঝারি গড়নের পুরুষের ওজন হওয়া উচিত ৫৫ কেজি + ১০ শতাংশ। আর একজন ঐ গড়নের ৫ ফুট লম্বা মহিলার ওজন হওয়া উচিত ৪৫ কেজি ± ১০ শতাংশ। এই ওজনের শতকরা ২০ ভাগ

সারণি ৪

পুরুষ		মহিলা	
উচ্চতা (সে মি)	ওজন (কেজি)	উচ্চতা (সে মি)	ওজন (কেজি)
১৬৩	৫৬-৬২	১৫০	৪৫-৫০
১৬৫	৫৮-৬৩	১৫২	৪৬-৫১
১৬৮	৫৯-৬৫	১৫৫	৪৭-৫৩
১৭০	৬১-৬৭	১৫৭	৪৯-৫৪
১৭৩	৬৩-৬৯	১৬০	৫০-৫৫
১৭৫	৬৫-৭১	১৬৩	৫১-৫৭
১৭৮	৬৬-৭৩	১৬৫	৫৩-৫৯
১৮০	৬৮-৭৫	১৬৮	৫৫-৬১

বেশি হলে তা নিশ্চয়ই ওজনাধিক্য বলে গণ্য হবে। ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি হলে তা মেদবাহুল্য বা ওবেসিটি। শিশুদের স্বাভাবিক বাড় ও ওজন সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকা উচিত। তিন মাসের শিশুর উচ্চতা হওয়া উচিত ৫৬·২ সেমি। ঠিকভাবে বাড়লে, ৬ মাস, ৭ থেকে ৯ মাস, ১০ ও ১২ মাসের শিশুর উচ্চতা হবে কমবেশি যথাক্রমে ৬২.৭ সেমি, ৬৪.৯ সেমি, ৬৯.৫ সেমি এবং ৭৩·৯ সেমি। ৬ মাসের বাচ্চার ওজন হবে তার জন্মকালের ওজনের দ্বিগুণ। ১ বছর ও দু বছরে তা বেড়ে হওয়া উচিত যথাক্রমে তিন ও চার গুণ। তারপর, তিন বছর বয়স থেকে শিশুদের প্রতি বছরে বাড়া উচিত ২ কেজি হারে—৬ বছর পর্যন্ত।

ভুল ধারণা

ব্যায়াম করলে মেদ কমে, কোন অপারেশনের পর মেদ বাড়ে, ম্যাসাজ ইত্যাদিতে মেদ কমে, উপোস করলে মেদ কমে, হার্টের অসুখে ওজন কমান খারাপ, বয়স বাড়ার সঙ্গে ওজন বাড়াই নিয়ম।

ঠিক কী?

ব্যায়াম নয়, পরিমিত খাদ্যই মেদ কমাতে পারে, অপারেশন নয়, অপারেশনের পর অহেতুক বেশি বিশ্রাম ও খাদ্যগ্রহণই মেদ বাড়ায়, ম্যাসাজ ইত্যাদিতে মেদ কমে না, উপোস করা হানিকর, হার্টের অসুখে ওজন কমাতেই হবে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজন কমা উচিত।

গৃহবধূরা মোটা হন কম পরিশ্রম ও বেশি খাদ্য গ্রহণের জন্য। বেশি খাদ্য গ্রহণ করা হয়ে যায় রান্নাঘরে খাবার চেখে, নিত্য বেঁচে যাওয়া খাবার ফেলে না দিয়ে তা নিজে খেয়ে ফেলেন।

অফিস কর্মীরা মোটা হন বারবার চা খেয়ে, অযথা খুচরো খাবার খেয়ে বসে বসে কাজ করে। চিন্তা, ভাবনা ও মানসিক অবসাদ খাবার ইচ্ছে বাড়ায়। তাই তাঁরা মোটা হন। ২৫ বছর বয়সের পর ওজনের সবটাই বাড়ে প্রায় মেদের ভারে।

সারণি ৩

চা ১ কাপ ৫০ ক্যালরি
কফি ১ কাপ ৯০ ক্যালরি
দুধ ১ কাপ ৬০ ক্যালরি প্রোটিন ৩.৫ গ্রাম
দুধ ১ গ্লাস ১৭০ ক্যালরি প্রোটিন ৭ গ্রাম
ডিম ১টা ৮৩ ক্যালরি প্রোটিন ৬ গ্রাম
ওমলেট ১টা ১৩০ ক্যালরি প্রোটিন ৬ গ্রাম
মাখন টোস্ট ১টা ১১০ ক্যালরি প্রোটিন ২ গ্রাম
কমলালেবুর রস (চিনি ছাড়া) ১ গ্লাস ২০ ক্যালরি

বিস্কুট ১টা (মিষ্টি) ৬৭ ক্যালরি
ডাল ১ প্লেট ৭৪ ক্যালরি প্রোটিন ৪.৫ গ্রাম
ময়দার লুচি (৩০ গ্রাম) ১টা ১০২ ক্যালরি
সব্জি ১ প্লেট ৫০ ক্যালরি

মটন কারি ১ প্লেট ১৭০ ক্যালরি প্রোটিন ১১.৪ গ্রাম
পাঁপড় ১টা ৫৮ ক্যালরি
আইসক্রিম ১ কাপ ১৫৪ ক্যালরি
চিনি ২ চা চামচ ৪০ ক্যালরি
ব্রান্ডি ১ পেগ বড় ৭৫ ক্যালরি
হুইস্কি ১ পেগ (বড়) ১২২ ক্যালরি

লুচি (১৫ গ্রাম) ১২৫ ক্যালরি প্রোটিন ১.৮ গ্রাম
রসগোল্লা ১টা ৩৫ ক্যালরি
সন্দেশ ১টা ৪৯ ক্যালরি প্রোটিন ১.৩ গ্রাম
কলা ১টা ১০০ ক্যালরি প্রোটিন ১.২ গ্রাম
আপেল ১টা ১০০ ক্যালরি
পেয়ারা ১টা ৫১ ক্যালরি
ডাব ১টা ৪৮ ক্যালরি প্রোটিন ২.৮ গ্রাম
ভাত ১ কাপ (২৫ গ্রাম) ৪৮·৬ ক্যালরি প্রোটিন ১.৬ গ্রাম
আলুভাজা (১ প্লেট চায়ের) ১৪২ ক্যালরি
পরটা (১টা) ১৫৬ ক্যালরি
মাছভাজা (৫০ গ্রাম) ১৯০ ক্যালরি প্রোটিন ১০.৯ গ্রাম
আলুর দম (১ প্লেট চায়ের) ১২৫ ক্যালরি
মুরগির কারি (১০০ গ্রাম) ১০০ ক্যালরি প্রোটিন ২০ গ্রাম
জেলি ২ চামচ ৫৫ ক্যালরি
বিয়ার (১ বোতল) ১৮৩ ক্যালরি
জিন ১ পেগ বড় ১৫০ ক্যালরি

যাঁরা মেদবাহুল্যে ভুগছেন তাঁদের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত মোটামুটি ১,৫০০ ক্যালরির মত, যাতে প্রোটিন থাকবে ৫০-৬০ গ্রাম। হ্যাঁ, মনে রাখা দরকার মেদ কমাতে কখনই কারোর তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।

মেদ কমাতে কোন ওষুধও গ্রহণ করা উচিত নয়। ওষুধগুলি মেদ কমায় ব্যক্তির খাবার ইচ্ছেকে কমিয়ে দিয়ে, যা আবার অন্যান্য নানান অসুখও সৃষ্টি করতে পারে। মনে রাখা দরকার মেদ কমাতে শুধু অল্প বা পরিমিত ক্যালরির খাবার গ্রহণই শ্রেষ্ঠ উপায়। অল্প ক্যালরির খাবার খাওয়ার মানে তা বলে আধপেটা খাওয়া নয়—যার পরিণামে মানুষ ক্লান্ত বোধ করতে পারে অর্থাৎ অল্প ক্যালরির খাবার খেলেও লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন ব্যক্তির অযথা খিদের উদ্রেক না ঘটায়। অল্প ক্যালরির খাবার দিয়ে পেট ভরাতে হলে মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জি খাওয়ার।

তাহলে কেউ মেদ কমাতে চাইলে বা তাঁর শরীরের ওজন পরিমিত রাখতে চাইলে তিনি কি আর কখনই ভালমন্দ কিছু খাবেন না? বেঁচে থাকাটা তো তাহলে তাঁর পক্ষে এক কঠিন শাস্তির সামিল হবে। না, শরীরের মেদে লাগাম পরাতে চেয়েও ইচ্ছে করলেই তিনি শখ করে প্রায়ই তাঁর খুশিমত অনেক কিছুই খেতে পারেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি কত পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করলেন মনে মনে তারও একটি হিসেব রাখতে হবে, যাতে তিনি সেদিন তাঁর অন্যান্য খাবার গ্রহণের সময় ক্যালরির পরিমাণ না বাড়িয়ে যান। ব্যাস, কষ্ট করে এইটুকু হিসেব করে লোভ সংবরণ করতে পারলেই তাঁর শরীর থাকবে মেদহীন এবং ওজন হবে প্রয়োজনমাফিক। □

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনে দুর্নীতি আছে কিন্তু খবরের কাগজে দুর্নীতির খবর বেরোলে দুর্নীতিগ্রস্তদের চাকরি যায়

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সংবাদপত্র সংগঠন যে এত বিশাল ও ব্যাপক হতে পারে তা পিপলস ডেইলি অফিসে না এলে বোঝা যেত না। বেইজিং শহর কেন্দ্র থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে এ'রা এক উপনগরী গড়ে তুলেছেন। ২৭ হেক্টর জমির উপর এ'দের অফিস। সব মিলিয়ে ওঁদের কর্মীর সংখ্যা ১৯০০। শতকরা ৮০জন ওঁদের কমপ্লেক্সের মধ্যেই থাকেন। পিপলস ডেইলি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাভদার মত। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র। অবশ্য পার্টি মুখপত্র বলতে আমরা যেরকম বুঝি সেরকম নয়। এই কাগজে খবরই মুখ্য। কর্মীদের মধ্যে অনেকেই পার্টির সদস্য নন। প্রফেশনাল সাংবাদিক তাঁরা। তবে ওপরের দিকে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের পার্টির সদস্য হতেই হয়।

মাত্র আট পৃষ্ঠার কাগজ পিপলস ডেইলি। চীনা ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকার চীনা নাম রেনমিন রেবো।

আগে এ'দের অফিস ছিল শহরের মধ্যে। ১৯৮০ সালে এই নতুন বাড়িতে এ'রা চলে আসেন। এখানে আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

পিপলস ডেইলির দৈনিক প্রচার ৫০ লক্ষ। চীনের বেইজিং ছাড়াও আরও ২১টি শহরে পিপলস ডেইলির সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে মূল সংস্করণের প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হংকং, টোকিও ও সানফ্রান্সিস্কো থেকে বিদেশ সংস্করণ ছাপা হয়।

পিপলস ডেইলি আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশ করে। যেমন অর্থনৈতিক সংবাদপত্র মার্কেট। স্যাটায়ার ও হিউমার সাপ্লিমেণ্ট জার্নালিস্টিক ফ্রণ্ট বলে সাংবাদিকতার ওপর একটি পত্রিকা। এছাড়া পিপলস ডেইলির এক মাসের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তাঁরা প্রকাশ করেন। পিপলস ডেইলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তার চিঠিপত্রের কলম। বছরে তাঁরা সাড়ে ছ লক্ষের মত চিঠি পান পাঠকদের কাছ থেকে।

পিপলস ডেইলি অফিসে কথা বললাম ও'দের আন্তর্জাতিক ডাইরেক্টর লোয়া আর চং-এর সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে সাংবাদিক রিক্রুট করেন?

লোয়া জবাব দিলেন: ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটদের মধ্যে থেকে। অন্যান্য কাগজে কাজ করার যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদেরও নিই।

: যেহেতু একটি পার্টির কাগজ, এখানে চাকরি পেতে গেলে কি পার্টির সদস্য হতে হয়?

: না, তার দরকার হয় না। তবে এডিটরদের মধ্যে পার্টির সদস্য সংখ্যা বেশি।

: আপনাদের কাগজ চীনে কতখানি শক্তিশালী? কীভাবে আপনারা চীনে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন? ব্যুরোক্র্যাসিকে ঠিক পথে চালাতে আপনারা কতখানি সফল হয়েছেন?

: দেখুন, কোন কাগজের শক্তি নির্ভর করে সে কাগজ কতখানি জনমতকে প্রতিফলিত করছে তার ওপর। আমাদের কাগজ এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান স্মাগলিং করছে। দেশের ক্ষতি হচ্ছে। আধুনিকতার বিরোধিতা করা হচ্ছে, একথা আমরা বারবার বলছি। আমাদের এই সমালোচনা সরকার শুনছেন, ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

: চীনে ব্যুরোক্র্যাসি কতখানি দক্ষ? তাঁরা কি সরকারের নীতি চটপট কার্যকর করতে পারেন, না তাঁদের ঢিলেঢালা ভাব রয়েছে?

: ব্যুরোক্র্যাসির মধ্যে সমস্যা আছে। কিন্তু এটা চীনের গুরুতর সমস্যা নয়। আমাদের ব্যুরোক্র্যাসি দক্ষ, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে দেরি হয়। আমাদের শ্লোগান—সময়ই অর্থ। যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে আধুনিকীকরণের ক্ষতি হবে।

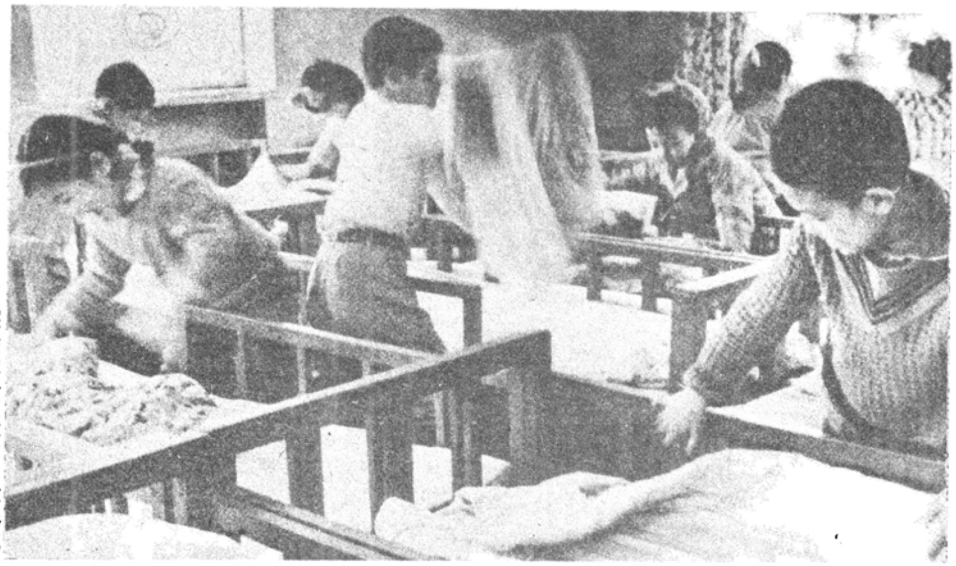
: দুর্নীতি কি চীনের সমাজে কোন গুরুতর সমস্যা?

: সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে চীনে কোন দুর্নীতি ছিল না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকেই এটি সমাজে ঢোকে। খোলা দরজা-নীতি গ্রহণ করার পর দুর্নীতি সমাজে ঢোকার আরও সুযোগ পায়। অন্তর্নিহিত অর্থ হল এটা আমরা পেয়েছি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উত্তরাধিকার হিসাবে। এখন প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা সরাসরি বিদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এর ফলে সুবিধা অনেক হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু সরকারি অফিসার এটা থেকে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটতে চাইছেন।

: যেমন সরকারি আমলাদের কেউ কেউ যখন বিদেশি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কোন চুক্তি করেন, তখন ঘুষ নিয়ে একটা মেশিনের দাম বেশি করে বাড়িয়ে নেন। আমরা অনেক উদাহরণ পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এ'দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসব হল অর্থনৈতিক অপরাধ। এটা একটা অসুখ। ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত দেশ বিপদে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে দরকার পার্টি সদস্যদের তালিকা পুনর্বিন্যাস করা। এই কাজের প্রাথমিক স্তর শুরু হয়েছে। প্রত্যেক পার্টি সদস্যের কাজকর্ম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সদস্যদের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার আছে কিনা সেটা দেখা হচ্ছে। তারপর নতুন করে তাঁদের তালিকা ভুক্ত করা হচ্ছে।

: আপনাদের লেখার ভিত্তিতে দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের কি বরখাস্ত করা হয়েছে?

: হ্যাঁ, অনেক ঘটনা আছে। সরকার প্রথমে তদন্ত করেন। সত্য প্রমাণিত হলে তাঁরা সরকারি অফিসারদের বরখাস্ত করেন।



বেইজিং-এ একটি কিন্ডারগার্টেন

: দুর্নীতির দায়ে যেসব লোকের চাকরি যায় তাঁরা তখন কোথায় চাকরি পান ?

: যাঁরা আইনভঙ্গ করেছেন, তাঁদের জেল হয়। পার্টির নাম ডোবালে তাঁদের পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। চাকরি গেলে তাঁদের অন্য কোন ছোট পদ নিতে হয়। তবে সরকারের বক্তব্য হচ্ছে এইসব ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়া। যদি তাঁরা ভুল বোঝেন, তখন তাঁদের আবার সমমর্যাদার পদে বহাল করা হয়।

: আপনাদের দেশে কি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম আছে ?

: না, ওই ধরনের কোন বিশেষ সাংবাদিকতা নেই। তবে সেরকম খবর পেলে আমরা অনুসন্ধানের জন্য সাংবাদিকদের পাঠাই।

: সাংবাদিকদের কোন সম্মানে ভূষিত করা হয় কি ?

: এই বছর থেকে শুরু হয়েছে। মডেল সাংবাদিককে সম্মান দেওয়া হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ রিপোর্ট-এর জন্য পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কাগজে প্রকাশিত বেস্ট স্টোরির জন্য পুরস্কার আছে। এরকম সব কাগজেরই পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। আবার জাতীয় ভিত্তিতে পুরস্কার আছে। পিপলস ডেইলিতে প্রকাশিত ভূপাল ঘটনার ওপর একটি রিপোর্ট শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। এই লেখাটি চীনা জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড সহানুভূতির সৃষ্টি করে। অবশ্য এই লেখাটি যিনি লেখেন তিনি আমাদের একজন সম্পাদক। তিনি নিউজ এজেন্সির রিপোর্ট অবলম্বনে রিপোর্টটি লিখেছিলেন। ভারতে আমাদের কোন সংবাদদাতা নেই। আমরা ভারতে সংবাদদাতা পাঠাতে চাই। একটু কিছুটা অসুবিধা আছে। সেটা দূর হলেই আমরা পাঠাব।

: ভারত সম্পর্কে আপনারা কী ধরনের খবর ছাপেন ? বিক্ষোভ ও গোলমালের খবরই বেশি ছাপা হয়, কিন্তু ভারতে এত উন্নতি হচ্ছে তার খবর ছাপেন না।

: রাজীব গান্ধীর কাজকর্ম, ভারতের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক, এসব খবর আমরা নিয়মিত প্রকাশ করি।

: কিন্তু ভারতের শিল্প, কৃষি এসব নিয়ে কিছু বেরোয় না, অথচ ভারতের কাগজে চীনের উন্নয়নের বিস্তৃত খবর প্রকাশিত হয়।

লোয়া বললেন : আমরা



ভারতের কৃষি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্কে অনেক খবর প্রকাশ করেছি। কিন্তু আমাদের কাগজ মাত্র ৮ পাতার। আন্তর্জাতিক খবরের জন্য মাত্র দুপাতারও কম বরাদ্দ। এই পাতার মধ্যে আমাদের সারা দেশের খবর প্রকাশ করতে হয়। তাছাড়া আমরা ভারতীয় খবর তেমন পাইও না।

: কেন, ভারতীয় দূতাবাস কোন প্রেস রিলিজ পাঠান না ?

: না। আমরা শুনেছি ভারত শিল্প, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক উন্নতি করেছে। আমরা চেষ্টা করব যাতে এই সব বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট ছাপতে পারি।

: ভারত সম্পর্কে আপনাদের সম্পাদকীয় মনোভাব কী ? সমালোচনামূলক, না সহানুভূতিমূলক— ক্রিটিক্যাল অর সফট ?

: আমরা বলব আমরা অবজেকটিভ। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে চীন ও ভারতের বোঝাপড়ার সম্পর্ককে ত্বরান্বিত করছি। আমরা রাজীব গান্ধীর খুব ইতিবাচক নীতি লক্ষ্য করছি। এ জন্য রাজীব গান্ধীর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল।

: আপনাদের কাগজ কি মনে করে, ভারত সোভিয়েতের দিকে বেশি করে ঝুঁকছে ?

: ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমরা জানি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা দরকারই। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে কিছু বলার নেই। তাঁদের পররাষ্ট্র নীতির আমরা সমালোচনা করি। আমাদের এই মতপার্থক্য থাকতেই পারে। তবে ভারত সোভিয়েত ব্লকে চলে গেছে একথা আমরা কখনই মনে করি না। ভারত স্বাধীন দেশ। প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি। ভারতীয় জনগণ কখনই চাইবেন না কোন বিদেশি শক্তির তাঁবেদার হতে, তা সেই শক্তি যেই হোক না কেন।

আলোচনার পর ছাপাখানা দেখতে গেলাম। ১০ হাজার বর্গমিটার জায়গা নিয়ে ওঁদের ছাপাখানা। সম্প্রতি আমেরিকার গস অফসেট মেশিন বসিয়েছেন ওঁরা। ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার কপি ছাপা হয়। সকাল চারটা থেকে ছ'টার মধ্যে শহর সংস্করণ ছাপা শেষ হয়ে যায়।

চীনা অক্ষরের সংখ্যা অজস্র হওয়ায় ছাপার ব্যাপারে এতদিন অসুবিধে ছিল। এখন ফোটো কম্পোজিং-এ অক্ষর সাজান হচ্ছে। সম্প্রতি বিদেশ সংস্করণ কম্পোজ হচ্ছে জাপানি কম্পোজিং মেশিনে। চীনা সংস্করণের জন্য এখনও হাতে কম্পোজ হচ্ছে। ছ হাজার চীনা ক্যারেক্টর লাগে পিপলস ডেইলি কম্পোজ করতে। মোট চীনা অক্ষরের সংখ্যা ৪৫ হাজারের মত। তবে এত অক্ষর কেউ মনে রাখতে পারেন না। কাজেও লাগে না। খুব পণ্ডিত লোকই ১২ হাজার চীনা ক্যারেক্টর জানেন শুনলাম। কে কত ক্যারেক্টর জানেন তা দিয়ে পাণ্ডিত্যের বিচার হয়। দৈনন্দিন কাজকর্মে তিন-চার হাজারের বেশি ক্যারেক্টরের দরকার হয় না। মাধ্যমিক পাস একজন সাত-আট হাজার ক্যারেক্টর জানেন। তিন হাজার ক্যারেক্টর জানলে চীনা সংবাদপত্র পড়ে মোটামুটি বোঝা যায়। এক-একটি চীনা ক্যারেক্টর এক-একটি শব্দকে বোঝায়। আবার একটি ক্যারেক্টরে কিছু চিহ্ন বসিয়ে তা দিয়ে অন্য শব্দ বোঝান যায়। আমরা যারা ধ্বনিগত ভাষা লিখে থাকি বা বলে থাকি তাতে করে আমরা আমাদের সীমিত অক্ষর দিয়ে যে কোন শব্দ উচ্চারণ অনুযায়ী তৈরি করে নিতে পারি। কিন্তু চীনা ভাষায় তা হবার উপায় নেই। সেখানে ক্যারেক্টরই শব্দ। আপনি কোন শব্দ শুনলেন, কিন্তু তার নির্দিষ্ট ক্যারেক্টর না জানলে সে শব্দ লিখতেই পারবেন না। চীনা ক্যারেক্টরের বদলে মান্দারিন চাইনিজকে রোমান হরফে রূপান্তরিত করে তাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এর নাম **Pinyin**. চীনে সর্বত্র রাস্তার নামে চীনা ক্যারেক্টরের পাশাপাশি এই পিনিন ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভির মাধ্যমেও পিনিন শেখান হচ্ছে দেখলাম। পিনিন ছাড়াও টিভির মাধ্যমে নানা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। টিভিতে জাপানি ভাষা শিক্ষার প্রোগ্রাম শুনলাম। নাটকের মাধ্যমে জাপানি শেখান হচ্ছে। ফরাসি শেখানর প্রোগ্রাম দেখলাম। ইংরেজি শিক্ষার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম 'ফলো মি' হচ্ছে টিভিতে। রেডিও ও টিভি চীনে কতখানি গণশিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে তার একটা প্রমাণ দেখে এলাম।

বেইজিং-এর হোটেলে লিফটে উঠছি। হোটেলের একটি বয় আমাকে দেখে বলে উঠল, ইণ্ডিয়া ?

আমি বললাম : হ্যাঁ। তুমি ইণ্ডিয়া জান ?

সে বলল : হ্যাঁ, দিল্লি-কলকাতা-বম্বে।

: কোথা থেকে জানলে ?

সে বলল, আমি টিভি কোর্স পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছি। টিভিতে ভূগোলের ক্লাসে শিখেছি।

আর একদিন হোটেলের ডাইনিং হলে খেতে বসেছি। রাত হয়ে গেছে, লোকজন কেউ নেই। সার্ভ করছিল যে তরুণীটি, সে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এসে আমায়, বলল : পরশু তোমাদের একজন নৃত্যশিল্পী বেইজিং-এ আসছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, মমতাশঙ্কর। খুব ভাল নাচেন, যদিও আমি তাঁর নাচ দেখিনি।

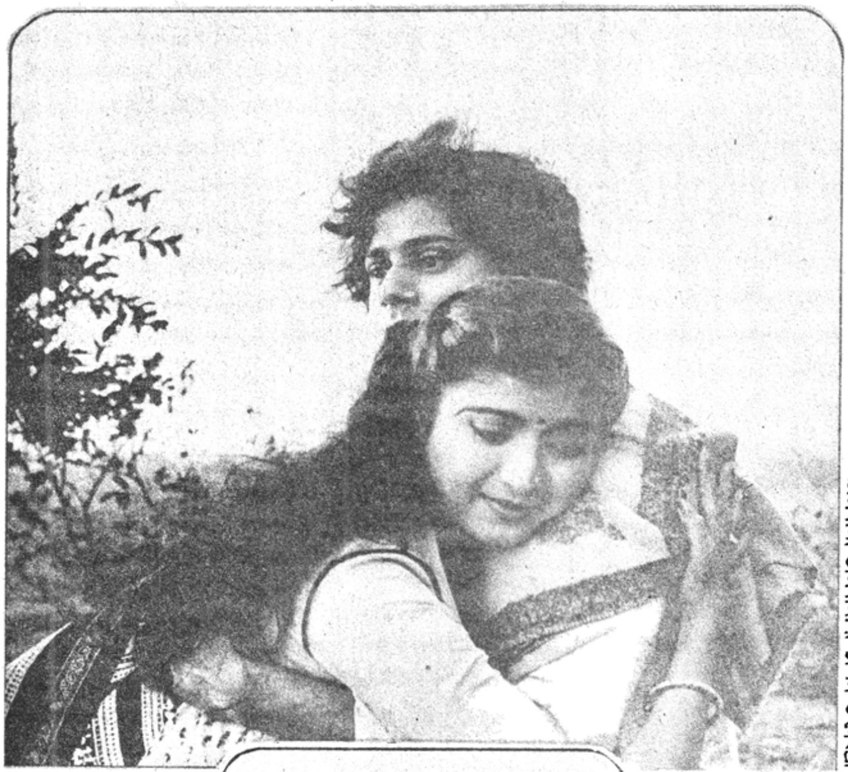
: তুমি যাবে ? আমার কাছে টিকিট আছে।

: না, কালই আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু এত ভাল নাচ, তুমি যাচ্ছ না কেন ?

মেয়েটি বলল : কাল সন্ধ্যায় টিভিতে আমার ইংরেজির ক্লাস পড়ে গেছে। ক্লাস ছেড়ে নাচ দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। □

(চলবে)

ফটো : সংগৃহীত



'ভালবাসা ভালবাসা'য় তাপস ও দেবশ্রী

'ভালবাসা ভালবাসা' দর্শকের ভালবাসা পাবে

'ভালবাসা ভালবাসা' ছবির কাহিনীর বিষয়বস্তু দর্শকের কাছে নতুন নয়। দুই সুদর্শন তরুণ-তরুণী, অরূপ ও কেয়ার মধ্যে এক নাটকীয় ঘটনায় প্রেমের সূত্রপাত। কেয়া বিত্তবান এবং আপাতদৃষ্টিতে কড়া মেজাজের মানুষ বিশ্বম্ভরের কন্যা। আর অরূপের জীবনটা দুর্ভাগ্যে বিপর্যস্ত। অরূপ কিন্তু ভেঙে পড়েনি। শিক্ষিত এবং অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী হয়েও অভিমানী অরূপ শহর ছেড়ে শহরতলিতে গিয়ে পোলট্রি খুলেছে। বলতে গেলে অরূপ ও কেয়া দুই মেরুর বাসিন্দা। তাই তাদের প্রেমের পথে অজস্র বাধা। অবশেষে মিলন। এই রকম চেনা প্লটের উপর ছবির কাহিনী গড়ে উঠলেও, মনে হয় 'ভালবাসা ভালবাসা সহজেই দর্শকের ভালবাসা আদায় করে নিতে সক্ষম হবে। কারণ পরিচালক তরুণ মজুমদারের ট্রিটমেণ্ট একটু ভিন্ন ধরনের। তাই অতি পরিচিত গল্পকেও তরুণবাবু রুচিশীল শিল্পবোধে কখনো মজাদার হৈ-হুল্লোড়ে, কখনো বা রোমাণ্টিকতার স্নিগ্ধ আমেজে ভরিয়ে দিয়েছেন। দারুণ স্পিডে অরূপ টেম্পো চালায়, কেয়া ভয়ে অরূপের বুকে মুখ লুকোয়, কিংবা কোন আবেগপূর্ণ মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গতা শিল্পের শর্ত ক্ষুণ্ণ না করেই পরিচালক এই ছবিতে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা যে কোন রুচিশীল দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে।

'ভালবাসা ভালবাসা' ছবিটির অভিনবত্ব রয়েছে উপস্থাপনাতে। তরুণবাবু এযাবৎকাল এত হিসেব কষে, এমন নিখুঁত উপভোগ্য গতিময় ছবি করেছেন কিনা সন্দেহ! 'বালিকা বধূ', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'দাদার কীর্তি' ছবির মধ্যে তরুণবাবুর যে চিন্তাভাবনা কাজ করেছিল, 'ভালবাসা ভালবাসা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এই ছবিটি অন্য সব ছবি থেকে স্বতন্ত্র। অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। ছবিটির 'ক্রেডিট টাইটেল'-এ যেমন নতুনত্ব রয়েছে, তেমনি সংলাপেও। এমনকী প্রতিটি 'শট' পর্যন্ত সুচারুভাবে বিন্যস্ত। অবশ্য এক্ষেত্রে রমেশ যোশী ও শক্তি রায়ের সম্পাদনা উল্লেখযোগ্য। যেমন প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় কেয়ার (দেবশ্রী রায়) বাবা বিশ্বম্ভরের (উৎপল দত্ত) বন্ধু অবনীভূষণ (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) কেয়াদের শিমুলতলার বাড়িতে বেড়াতে আসছেন। বিশ্বম্ভর সকাল থেকে উঠেই তাই হৈচৈ শুরু করে দিয়েছেন। এমন সময় বিশ্বম্ভরের স্ত্রী মনোরমা (রুমা গুহঠাকুরতা) এসে স্বামীর এই 'তর্জন-গর্জন' নিয়ে মন্তব্য করেন। রুমাদেবীর 'গর্জন' শব্দটি বলার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য বদলে যায়। দেখা যায় প্রচণ্ড শব্দ করে একটি রেল শিমুলতলা স্টেশনে 'ইন' করছে। ওই ট্রেনেই আসছেন অবনীভূষণ। আবার অবনীভূষণ যখন কেয়ার কথা জিগ্যেস করেন, তখন কেয়ার কাকা (অনুপকুমার) যেই বলেন 'কেয়া তো এখন হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ছে,' সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যান্তর ঘটে। দেখা যায়, হোস্টেল পরিচালিকা হিসাবে কেয়া পচা ডিম দেবার অভিযোগে ডিম-বিক্রেতা অরূপকে (তাপস পাল) ধমকাচ্ছে। অথবা কেয়ার গানের প্রসঙ্গে বিশ্বম্ভর ও অবনীভূষণের কথাবার্তা থেকে 'কাট' করে কেয়ার গানের স্কুলে দৃশ্যটি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কেয়াকে একজন শিল্পীর সঙ্গে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' রবীন্দ্রসঙ্গীতের রিহার্সাল দিতে দেখা যায়। এইরকম ছোট ছোট, অথচ অত্যন্ত স্মার্টনেসের সঙ্গে 'ভালবাসা ভালবাসা'-কে তরুণবাবু সাজিয়েছেন।

যেহেতু নায়ক অরূপ একজন প্রখ্যাত গায়িকা প্রতিমা দেবীর (মাধবী চক্রবর্তী) পুত্র এবং নায়িকা কেয়া সুগায়িকা, তাই এই ছবির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সঙ্গীত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত এই ছবির একটি বড় সম্পদ। ছবিতে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলিও দৃশ্যানুযায়ী সুপ্রযুক্ত। দিব্যেন্দু ও শোভনা (সন্তু মুখার্জি ও সুমিত্রা মুখার্জি) পরিচালিত গানের স্কুলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অরূপের কণ্ঠে 'হার মানা হার পরাব তোমার গলে'—অসাধারণ সংযোজন। কারণ ঠিক এই দৃশ্যের আগে অরূপ ও কেয়ার মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, তার অবসান ঘটেছে এমন দৃশ্যের অবতারণায়। এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি 'সিকোয়েন্স'-উপযোগী। তবে শিমুলতলায় বিজয়া সম্মিলনীর দৃশ্যে, অরূপ যখন গানের মাধ্যমে নিজের জীবনের কথা শোনাচ্ছে সেই গানটিকে বড় দীর্ঘ ও সুরটি বড় সাদামাটা মনে হয়। কিন্তু 'চুরি করা মহাপুণ্য' গানটির মধ্যে সুন্দর সুরের বৈচিত্র্য রয়েছে।

'ভালবাসা ভালবাসা' ভাল লাগার অন্য দিকটি হল অভিনয়। প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ই স্বতঃস্ফূর্ত। নায়ক-নায়িকা হিসাবে তাপস পাল ও দেবশ্রী রায়কে দারুণ মানিয়েছে। ভাল লাগে সন্তু মুখার্জি ও সুমিত্রা মুখার্জিকে। বিশেষ করে সন্তু মুখার্জিকে গানের স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষক হিসাবে তো মানিয়েছেই, তেমনি তিনি স্বকণ্ঠে 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে' গানটিও ভাল গেয়েছেন। এছাড়া উৎপল দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তরা সিনহা, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। তবে তরুণবাবু কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু অন্যরকম ভাবে কাজে লাগাতে পারতেন। 'দাদার কীর্তি' এবং ভালবাসা ভালবাসা' দুটি ক্ষেত্রেই কৌশিককে দিয়ে তিনি প্রায় একই রকম চরিত্রে অভিনয় করালেন। যদিও কৌশিক এবারও অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয়ই করেছেন।

চলচ্চিত্র কথাটার অর্থ চলমান চিত্র। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুদ্ধিদীপ্ত ক্যামেরার কাজ রঙিন এই বাংলা কাহিনীচিত্রটিকে সত্যিই চলমান চিত্র করে তুলেছে। শিমুলতলার নিসর্গ দৃশ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানের দৃশ্যে বা অন্যান্য দৃশ্যেও আলো ও রঙের ব্যবহার, নিপুণ দৃশ্যসজ্জায় ছবিটিকে শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোন ছবি বলেই মনে হয়।

'দাদার কীর্তি'র পর ছবিতে আশানুরূপ ব্যবসায়িক সাফল্য না পেয়ে তরুণবাবু হয়ত অনেক ভেবেচিন্তেই 'ভালবাসা ভালবাসা'-র মত একটি উপভোগ্য প্রমোদচিত্র বাংলা ছবির দর্শককে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। বোধহয় এই ব্যাপারে তিনি সফলও হয়েছেন। ☐

ফটো: অর্ধেন্দু রায়

বি এফ জে এ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান



বি এফ জে এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

শত ফুল বিকশিত হোক, শত আগাছা নির্মূল হোক—ক্যালকাটা পিপলস কয়্যার পরিবেশিত উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে ৪৮তম বি এফ জে এ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল গত ১১ অক্টোবর রবীন্দ্র সদন মঞ্চে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন প্রবীণ চলচ্চিত্রকার হীরেন বসু, এন এফ ডি সি-র চেয়ারম্যান হৃষীকেশ মুখার্জি, হেমন্ত মুখার্জি, বেণু গোপালন এবং তপন সিংহ।

বি এফ জে এ-র প্রাণপুরুষ বাগীশ্বর ঝা' অসুস্থ থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর লিখিত ভাষণ পড়ে শোনান প্রদীপ বিশ্বাস। কিন্তু যাঁদের দেখার জন্য দর্শকরা কলকাতার জ্যামজটের বেড়াজাল ডিঙিয়ে বহু কষ্টে নির্দিষ্ট সময়ে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেইসব আকাঙ্খিত উজ্জ্বল তারকারা সকলেই প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকী পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যেও অনেকে অনুপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, বাংলা চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিত্বদের মধ্যে একমাত্র অনিল চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকেই প্রেক্ষাগৃহের ধারে-কাছে দেখা যায়নি। অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রের 'প্রোগ্রাম'-এর ৮ নং আইটেমে ছিল 'সংস বাই অ্যাওয়ার্ড উইনার্স।' না, একমাত্র উদ্বোধন সঙ্গীত ছাড়া আর কোন সঙ্গীত শোনা যায়নি। অবশ্য পাওনা হিসাবে চলচ্চিত্র সমালোচকরা প্রখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ-র কাছ থেকে কিছু 'জ্ঞানগর্ভ' সমালোচনা শুনতে পেয়েছেন। সমালোচকদের সমালোচনা করার একটা প্ল্যাটফর্ম তপনবাবু ওদিন পেয়ে গিয়েছিলেন। সুযোগের তিনি পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেছেন।

হৃষীকেশ মুখার্জি বি এফ জে এ-র কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত তাঁর বক্তৃতায় বর্তমানে মানুষের জীবনে সিনেমার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

এরপর শুরু হয় পুরস্কার প্রদান পর্ব। এবারে পুরস্কারের তালিকায় সিংহভাগ দখল করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত 'গৃহযুদ্ধ' ছবিটি। গুণানুসারে 'খণ্ডহর', 'গৃহযুদ্ধ', 'দখল', 'অর্ধসত্য' এবং 'সারাংশ' ১৯৮৪-র শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয়। ১৯৮৪-র শ্রেষ্ঠ বিদেশি চিত্র হিসাবে 'মেক্সিকো ইন ফ্লেমস' বি এফ জে এ পুরস্কার পায়। ১৯৮৪ সালের বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পান যথাক্রমে গৌতম ঘোষ ও মমতাশঙ্কর 'গৃহযুদ্ধ'-এ অভিনয়ের জন্য। হিন্দিতে 'খণ্ডহর' ছবির নায়িকা শাবানা আজমী শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এবং 'অর্ধসত্য' ছবিতে ওম পুরী শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান। দর্শকদের দুর্ভাগ্য, এ'দের কেউই ওদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। অনুপস্থিত ছিলেন ১৯৮৪-র হিন্দি ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক মৃণাল সেন ও শ্রেষ্ঠা সহ অভিনেত্রী গীতা সেন। এ'দের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন জগদীশ চৌখানি। যদিও বাংলা ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার প্রাপক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা সুনীল মুখার্জি, শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী মণিদীপা রায় স্বহস্তে পুরস্কার গ্রহণ করেন, কিন্তু 'অর্ধসত্য' ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা সদাশিব অমরাপুরকার উপস্থিত ছিলেন না।

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্বের জন্যে ১৯৮৪-র বি এফ জে এ পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক ছাড়াও পুরস্কার পান দিব্যেন্দু পালিত, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র কাপুর, ভাস্কর চন্দ্রভারকর, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, ইন্দু জৈন, ক্যামেরাম্যান বিজয় দে, কে কে মহাজন, আর্ট ডিরেক্টর সুরেশ চন্দ্র, নীতীশ রায়, সম্পাদনার জন্য উজ্জ্বল নন্দী, মৃন্ময় চক্রবর্তী, অনুপম খের, নমিতা রায় এবং প্রীতি সাগর।

এছাড়া লাক্স ট্রফি লাভ করেন 'খণ্ডহর' ছবিতে অভিনয়ের জন্য শাবানা আজমী ও 'গৃহযুদ্ধ' ছবির জন্য মমতাশঙ্কর। দিব্যেন্দু পালিত শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসাবে পবনদাস চৌখানি স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। হেমন্ত মুখার্জি এবং প্রবীণ চলচ্চিত্রকার ও সঙ্গীতজ্ঞ হীরেন বসুকে বি এফ জে এ-র তরফে মানপত্র প্রদান করা হয়।

আগে বি এফ জে এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যে বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করত, এবারের অনুষ্ঠান মনে হল যথাযোগ্য আয়োজনের ত্রুটিতে বড় মলিন, বৈচিত্র্যহীন! তবুও জর্জ বেকার অনুষ্ঠান পরিচালক হিসাবে দর্শক মনোরঞ্জনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। □

সঞ্জয় সিংহ

ফটো : শংকর নাগ দাস

মল্লার-এর আবোল তাবোল



হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।

'কেমন করে হল তা না জানলেও এ ছড়া প্রথম পড়ার ভাগ্য যাদের হয় তাদের মধ্যে বিচক্ষণেরা নিশ্চয় বুঝেছিল যে ব্যাকরণ না মানা এমন উদ্ভট আজগুবী লেখা বাংলা ভাষায় আগে কথনো বার হয়নি।' গত ১৫ অক্টোবর সুকুমার রায়ের এমন উদ্ভট আজগুবী লেখা' 'আবোল তাবোল'কে বর্ণাঢ্য এবং নাচে-গানে ভরপুর করে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে হাজির করলেন 'মল্লার' গোষ্ঠী, তাদের আটাশতম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে। এ'রা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করলেন 'আবোল তাবোল', 'খিচুড়ি', 'প্যাঁচা-প্যাঁচানি', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম', 'ফসকে গেল', 'নেড়া বেলতলায় কবার যায়', 'কি মুস্কিল', 'নারদ নারদ', 'বোম্বাগড়ের রাজা', 'বিজ্ঞান শিক্ষা', 'সৎপাত্র', 'গানের গুঁতো', 'কুমড়ো পটাশ' এবং 'হুলোর গান'।

মল্লার-এর এই অনুষ্ঠান আর দশটা সাংস্কৃতিক সংস্থার বাৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠানের মত সাদামাটা বা দায়সারা গোছের ব্যাপার নয়। বরং একটি দুঃসাহসী প্রচেষ্টা। তিন থেকে তের বছরের দুশো শিশুকে একসঙ্গে মঞ্চে হাজির করে, সুশৃঙ্খল রেখে, তাদের দিয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে নৃত্য পরিবেশন করান, এ এক অকল্পনীয় ব্যাপার। সেই অকল্পনীয় ব্যাপারটির সফল রূপায়ণ সম্ভব হল একটি অসাধারণ কোরিওগ্রাফির জন্যে। অসিত চট্টোপাধ্যায়ের এই কোরিওগ্রাফ শুধু দুচোখ ভরে দেখার নয়, মন দিয়ে শেখারও।

'কথার ঝংকার আর ভেলকি'ভরা কবিতাগুলির নাট্যরূপ দিয়েছেন জ্যোতিভূষণ চাকী। সুর সংযোজনা তাঁরই। নাট্যরূপ কবিতার মেজাজে মেজাজি। আর সুর সংযোজনা প্রসঙ্গে ও'র কথাতেই বলি 'হিউমার জিনিসটাই বড্ড মেজাজি ব্যাপার, সুরে তাকে ধরবার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু সে অধরা'। তাই ও'র ভয় ছিল 'একান্তভাবে শিশু-শিল্পীদের দিয়েই গানগুলি করাচ্ছি বলে গায়ন-রীতিটি সর্বত্র অভিনয়-ভঙ্গিম না হওয়ায় কিছু কিছু সুর বৈশিষ্ট্য মার খেতে বাধ্য'। বস্তুত কিছু ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। কিন্তু সুপরিকল্পিত আবহ সঙ্গীতের বৈচিত্র্য সেই খামতির অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে। সেই সুসমঞ্জস আবহের রচয়িতা দিলীপ রায়কে সাধুবাদ জানাই।

সাধারণত মঞ্চের কালো ব্যাক-ড্রপেই নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়, আমরাও তাই দেখি। কিন্তু এক্ষেত্রেও 'মল্লার' ব্যতিক্রান্ত। ননসেন্স-রাইমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, 'ভুলের ভবে অসম্ভবের ছন্দেতে' শিল্প নির্দেশক নিতাই ঘোষ তৈরি করেছেন একটি সেট যা আপাতদৃষ্টিতে 'বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া, নিয়ম-হারা হিসাবহীন'। কিন্তু নান্দনিকতায় মনোহারী। শিশু শিল্পীদের শিরোভূষণও তাঁরই পরিকল্পনা। ওইগুলি দেখলেই মনে পড়ে 'সিংহের সিং নেই, এই তার কষ্ট / হরিণের সঙ্গে মিলে সিংহল পষ্ট।'

নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'কুমড়ো-পটাশ' সম্ভবত শিশু শিল্পীদের ক্লান্তির জন্য কিঞ্চিৎ এলোমেলো। অন্যগুলি সুপরিবেশিত। তবে আলোকসম্পাতী কণিষ্ক সেন একটু সনিষ্ঠ হলে গোটা অনুষ্ঠান আরো বর্ণাঢ্য হত। আর অনুষ্ঠান ঘোষিকার ঘাড় বেঁকিয়ে মঞ্চে দাঁড়ানটা দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাঁর সজোর স্বরক্ষেপণ দর্শক-শ্রোতাদের শ্রবণ যন্ত্রগুলিকে রীতিমত কষ্ট দিয়েছে। এই ত্রুটিগুলি না থাকলে মল্লার-এর অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলতে কোন বাধা ছিল না। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফটো : রামু ব্যানার্জি

কলকাতায় দুই রুশী অভিনেত্রী

সম্প্রতি নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যোগদানের প্রাক্কালে কলকাতা ঘুরে গেলেন দুই প্রথিতযশা সোভিয়েত চলচ্চিত্রাভিনেত্রী এলেনা ৎসিপ্লাকোভা এবং নাতালিয়া ভাভিলোভা।

ইউ এস এস আর কনস্যুলেট জেনারেলের তথ্য-কেন্দ্রে এই দুই অভিনেত্রীর সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন 'সোভেক্সপোর্টফিল্ম'-এর নয়া দিল্লি প্রতিনিধি মি. ও. কুমিরভ।

২৭ বছর বয়সী এলেনা ৎসিপ্লাকোভা মাত্র ১৪ বছর বয়সে একটি শিশু চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য লেনিনগ্রাদ স্টুডিওতে কাজ করতে আসেন। ১৭ বছর বয়সে দ্য মস্কো ইনস্টিটিউট অব সিনেমাটোগ্রাফিতে অভিনয় শিক্ষার জন্য যোগদান করেন এবং শিক্ষা চলাকালীনই 'হেট্রেড' নামে পশ্চিমী ধাঁচের একটি ছবিতে একজন কসাক সেনাপতির স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্নাতক হবার পর, এলেনা পৃথিবীখ্যাত ম্যালি (Maly) থিয়েটারের

নাতালিয়া (বাঁয়ে) এবং এলেনা। ফটো : অরুণ্য সেন



সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিভিন্ন নাটকে ন'খানি প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য এলেনা আবার দ্য মস্কো ইনস্টিটিউট অব সিনেমাটোগ্রাফিতে ফিরে যান। এবার তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। বর্তমানে এলেনা মসফিল্ম স্টুডিওতে সহকারী পরিচালিকা এবং অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করছেন।

এলেনা ৎসিপ্লাকোভা অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'উই আর ফ্রম জ্যাজ' এবং 'লাকি চেঞ্জ'। এই দুটি ছবি শুধু রাশিয়াতেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে আগত অন্য অভিনেত্রী সুন্দরী নাতালিয়া ভাভিলোভার বয়স ২৫। এলেনা ৎসিপ্লাকোভার মত নাতালিয়ারও চলচ্চিত্র জীবন শুরু ১৪ বছর বয়সে। পূর্বে বিখ্যাত সার্গেই বন্দরচুক-এর সঙ্গে 'সাচ বিগ মস্কৌন' ছবির মাধ্যমে নাতালিয়ার চলচ্চিত্র জীবনে প্রবেশ। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই নাতালিয়া ছাত্রদের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রকের অধীন 'সেক্রেটারিশিপ' শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তিনি ভর্তি হন। কিন্তু শিক্ষা শেষ হবার আগেই, সব ছেড়েছুড়ে তিনি দ্য মস্কো ইনস্টিটিউট অব সিনেমাটোগ্রাফিতে ভর্তি হন। এই সময়ে নাতালিয়ার উল্লেখযোগ্য চরিত্র চিত্রণ দেখা যায় 'রেড ডিপ্লোম্যাটিক ক্যুরিয়ার্স' ছবিটিতে। যদিও এখন অবধি তাঁর স্মরণীয় অভিনয় অস্কার বিজয়ী বিখ্যাত সোভিয়েত ফিল্ম 'মস্কো ডাজ নট বিলিভ ইন টিয়ার্স' ছবিটিতে। এই ছবিটি দুই বোনের জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। নাতালিয়া এই ছবিটিতে নায়িকার কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ছবিটি শুধু রাশিয়াতেই নয়, পশ্চিম ইউরোপে এবং আমেরিকাতেও বেশ জনপ্রিয় হয়।

নাতালিয়া ভাভিলোভা বর্তমানে গোর্কি স্টুডিওর সঙ্গে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ। গোর্কি স্টুডিওতে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ছবি নির্মিত হয়। এছাড়া নাতালিয়া ভাভিলোভা দূরদর্শনেও অভিনয় করেন।

সংবাদদাতা

শার্লে সেগানের পিয়ানো লহরী

তিনি এলেন: দেখলেন নয়, দেখালেন। ও জয় করে ফিরে গেলেন।

প্রায় পৌনে দু ঘণ্টাব্যাপী পিয়ানো বাজনার **অনুষ্ঠান উপভোগ করে** বিলাসবহুল ও আরামপ্রদ **প্রেক্ষাগৃহটি থেকে** বেরিয়ে আসার সময় পিয়ানো **সঙ্গীত অনুরাগী দর্শক** তথা শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই **এই অনুভূতি প্রকাশ** করলেন। কয়েকজনকে বলতে **শুনলাম, ওয়েস্টার্ন** ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক যে এত **প্রীতিকর ও রিদমিক্যাল** হয়, আগে জানতাম না।

কলকাতার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য দপ্তরের অধি**কর্তা কেনেথ উয়িমেলের** সৌজন্যে মাত্র সাত মাস আগে **লরেটো কলেজে** অনুষ্ঠিত আমেরিকার পিয়ানো **শিল্পী রুথ ক্রেনকিনসকার** কাছ থেকে উনবিংশ **শতাব্দীর প্রখ্যাত** পিয়ানো সঙ্গীত স্রষ্টা ফ্র্যান্স লিসৎ, ডোমেনিকো স্কারলাত্তি, ফ্রেডারিক শপেন, শার্গেই **র‍্যাকম্যানিনফ ও বিংশ** শতাব্দীর ভার্জিল থমসন ও



শার্লে অ্যানি সেগান। ফটো: লেখক সংগৃহীত

সার্গেই প্রোকোফিয়েফের বাজনা শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। শার্লে অ্যানি সেগানের পিয়ানো বাজনা শোনার আগে আমিও জানতাম না যে, জ্যাজ ও ডিসকো সঙ্গীতের যুগে আমেরিকায় জোহানস ব্রাহমস ও লুডউয়িগ ভ্যান বীথোভেনের তৈরি উচ্চাঙ্গ পিয়ানো সঙ্গীতের চর্চা এত বেশি। বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের উল্টোদিকে নির্মীয়মাণ বিশালকায় মন্দিরটির নিচে নবনির্মিত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সভা ঘরে গত ৯ সেপ্টেম্বরের সান্ধ্যকালীন পিয়ানো অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তাও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য দপ্তরের কলকাতা শাখার অধিকর্তা কেনেথ উয়িমেল। একক শিল্পী ছিলেন আমেরিকার অন্যতম 'আর্টিস্টিক অ্যামব্যাসাডর' শার্লে অ্যানি সেগান।

প্রোগ্রামে জোহানস ব্রাহমসের 'প্রেস্টো এনার্জিকো' অর্থাৎ দ্রুত-গতিতে আলাপ শুরু করে সার্গেই প্রোকোফিয়েফের সোনাটা 'প্রিসিপিটেটো' অর্থাৎ দ্রুত-লয়ে শেষ করার কথা থাকলেও সেগান তাঁর বাজনায় অভিভূত সঙ্গীত অনুরাগীদের সবশেষে উপহার দিলেন সূচি-বহির্ভূত সুমধুর লহরী ফ্রেডারিক শপেনের সোনাটার একটা টুকরো। সেগানের পিয়ানো চর্চা শুরু হয় মাত্র চার বছর বয়সে। সুতরাং তাঁর পিয়ানো অনুশীলনের ইতিহাস প্রায় পঞ্চাশ বছর বা তারও কিছু বেশি সময়ব্যাপী। মিচিগানের ডেট্রয়েট আর্ট কলেজ থেকে লোকসঙ্গীতে স্নাতক হওয়ার পর প্যারিসে গিয়ে বিখ্যাত পিয়ানো শিল্পী ও সুরস্রষ্টা আলফ্রেড কর্টট ও জুল্স জেন্টিলের কাছ থেকে তালিম নেন। স্ক্যান্দিনেভিয়ান সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা, ল্যানসিং সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা, ফ্লিন্ট সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা ও জয়েস সেন্টার অর্কেস্ট্রার মত খ্যাতিসম্পন্ন বাজনার দলের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছেন।

পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এত বড় শিল্পীর বাজনার মধ্যে মাঝে মাঝে যে জিনিসের অভাব বোধ করছিলাম, তা হল পোর্টামেন্টো। একক বাদ্য-সঙ্গীতে, বিশেষ করে পিয়ানো বাজনার 'সোনাটা' ও 'প্রিলিউডে' যেটির সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। একটা সুর বা অংশ থেকে আর একটা সুর বা অংশে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাওয়ার মুনশীয়ানাই 'পোর্টামেন্টো'। তবে তাঁর বাজনার 'অ্যালেগ্রো' অর্থাৎ দ্রুতগতি ও 'ক্রেসেণ্ডো' বা 'ডিক্রেসেণ্ডো' অর্থাৎ সুর-ঝঙ্কার ওঠা ও নামানর মধ্যে এত বেশি দক্ষতা ও মাধুর্য, যা শ্রোতৃমণ্ডলীকে অন্য কোনও প্রভাব বুঝতে দেয়নি। নিথর প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি অতিথি নিবিষ্ট চিত্তে সেগানের বাজনা শুনলেন। এক কথায়, সবাই মুগ্ধ। □

মুক্তিপদ চৌধুরী

দূরদর্শন-সমাচার

ছিয়াশি সাল থেকে দূরদর্শনে রঙিন বাংলা ছবি দেখা যাবে

ভারতে দূরদর্শনের বয়স এখন ২৫ বছর। আর কলকাতায় বছরদশেক। দশ বছর অবশ্য খুব কম সময় নয়। এই সময়ের মধ্যে দূরদর্শনের অনেক উন্নতি ঘটেছে। এতদিন শুধু কালো-সাদা ছবিই দর্শকরা দেখেছেন। এখন রঙিন ছবিও দেখতে পাচ্ছেন।

ভারতে মোট চারটি কালার ও বি ভ্যান এসেছে --দিল্লি, বম্বে, জলন্ধর আর কলকাতায়। ১৯৮৩-র মে মাস থেকে কলকাতা দূরদর্শন দর্শককে রঙিন প্রোগ্রাম দেখাতে পারছেন। বর্তমানে স্টুডিও ফ্লোরে কাজ করছে তিনটি ই এন জি ক্যামেরা। স্টুডিওর বাইরে দু ধরনের ভিডিও ক্যামেরায় রঙিন ছবি তোলার কাজ হয়। এর মধ্যে রয়েছে ভি এইচ এস ও ইউ-ম্যাটিক ক্যামেরা। শনিবারের বিকেল অত্যন্ত আকর্ষণীয় কলকাতার দর্শকের কাছে। কারণ সেদিন বাংলা সিনেমা দেখান হয়। কিন্তু বাংলা রঙিন সিনেমা দর্শকরা দূরদর্শনের পর্দায় সাদা-কালোয় দেখেন। অথচ দিল্লি থেকে রবিবারের রঙিন ফিল্ম রঙিনই সম্প্রচারিত হয়।

এবারে নতুন বছরের শুরুতে কলকাতা দূরদর্শনে নতুন খবর—১৯৮৬-র শুরুতে রঙিন বাংলা সিনেমা রঙিনই দেখা যাবে। ভারত ইলেকট্রিকালস লিমিটেডের কাছ থেকে একটি মেশিন পাওয়া যাবে। কলকাতা দূরদর্শনের নিজস্ব স্টুডিওটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, সেইজন্য জায়গার অভাব রয়েছে। ১,২০০ বর্গ ফুট আয়তনের এই স্টুডিওতে স্থানাভাব সত্ত্বেও কলকাতা দূরদর্শন সংস্থা এই মেশিনটি পেলেই কাজ শুরু করতে আগ্রহী। এখন রঙিন প্রোগ্রামের কাজ কালার ও বি ভ্যান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে গলফ গ্রীনে দূরদর্শনের নতুন স্টুডিও তৈরি হলে সেখান থেকেই সবরকম কাজ করা যাবে। রেকর্ডিং কিংবা ট্রান্সমিশনের কাজের জন্য আর কালার ও বি ভ্যান দরকার হবে না। দিল্লি এবং বম্বেতে কালার টেলিসিন এসে গেছে। কলকাতাতেও কিছুদিনের মধ্যেই আসবে। □

মহুয়া ভট্টাচার্য

আ	বা	স	স্থ	ল	■	ত	হ	সি	ল	দা	র
■	র	■	প	ক্ষ	■	মো	■	■	■	বী	জ
গ	ণ	প	তি	■	ম	হা	ন	ব	মী	■	■
জ্ঞ	■	ল্প	■	আ	হা	■	খ	র	■	আ	শ
রা	ঘ	ব	■	মা	ল	ক্ষ্মী	■	দা	স	খ	ত
জ	টা	■	বি	জ	য়া	■	ব	■	ম	র	দ
■	ন	ল	ব	ন	■	কা	র্তি	কে	য়	■	ল
শ	■	ব	র	■	কা	■	কা	কা	■	প্র	■
কু	র	ঙ্গ	■	চা	ল	ক	■	র	ঙ্গ	শা	লা
ন্ত	■	■	■	না	সা	■	শি	ব	■	স	■
লা	ক	■	বা	■	প	র	খ	■	স	ন	দ
■	দু	র্গা	পু	জো	■	স	র	স্ব	তী	■	ন্ত

শব্দশৃঙ্খল (শারদীয়)-এর জন্য ৫০ টাকা করে উপহার পাবেন : ১। অমিতাভ শীল (হাওড়া-১) ২। বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী (কলকাতা-৩৮) ৩। প্রবোধকুমার মণ্ডল (রামনগর, বর্ধমান) ৪। সুজিত-কুমার সামন্ত (রায়না, বর্ধমান) ৫। বরুণকান্তি ঘোষ (মগরা, হুগলী)। সার্টিফিকেট পাবেন : ১। বীণাপাণি সাহা (ডিব্রুগড়, আসাম) ২। ভবানী গুহ (আগরপাড়া, ২৪ পরগণা) ৩। তমোজিৎ ভট্টাচার্য (মালুগ্রাম, আসাম) ৪। রাধাশ্যাম আচার্য (খোয়াই, পঃ ত্রিপুরা) ৫। সূর্যশেখর মুস্তফী (দিনহাটা, কুচবিহার) ৬। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় (কালনা, বর্ধমান) ৭। সুরুচী পাহাড়ী (ললাট, মেদিনীপুর) ৮। শুভব্রত হাইত (কলকাতা-২৫) ৯। বাসবী রায় (কলকাতা-২৬) ১০। বাণী রায় (হাওড়া-৪) ১১। রেণুকা গোস্বামী (বেলারী, বর্ধমান) ১২। দেবাশীষ ভট্টাচার্য (বাঁশদ্রোণী, ২৪ পরগণা) ১৩। তপন বিশ্বাস (হাজরাপাড়া, কোচবিহার) ১৪। মেখু দাশ (কনকপুর, শিলচর-৫) ১৫। অরূপ ভট্টাচার্য (মহুলা, মুর্শিদাবাদ) ১৬। শুভেন্দু প্রধান (আমড়াতলা, মেদিনীপুর) ১৭। জ্যোৎস্না-রানী পাল (রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া) ১৮। সমরেন্দ্র মালিক (কলকাতা-২০) ১৯। প্রবোধ দত্ত (মুরারই, বীরভূম) ২০। জান্নাতুন খাতুন (নিশ্চিন্তপুর, মুর্শিদাবাদ) ২১। শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী (জয়নগর, ২৪ পরগণা) ২২। স্বপনকুমার সেন (আনন্দপাড়া, ডিব্রুগড়) ২৩। দিব্যেন্দু সাহা (করিমগঞ্জ, আসাম) ২৪। রজত গুহ রায় (তুফানগঞ্জ, কুচবিহার) ২৫। দেবাশিস গুহ বিশ্বাস (নিউ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা) ২৬। সুদীপ্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা-২৯) ২৭। অরুণভূষণ দত্ত (কলকাতা-৯২) ২৮। চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (কলকাতা-৪৮) ২৯। অঞ্জন লাহিড়ী (ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া), ৩০। সুধাংশুশেখর রাউৎ (ইন্দা, মেদিনীপুর) ৩১। রবীন্দ্রনাথ ধর (কলকাতা-১০) ৩২। গৌতম সাহা (নাটরপল্লী, বর্ধমান) ৩৩। বি বি রায় (নবপল্লী, দঃ বারাসাত) ৩৪। বিশ্বনাথ বেরা (সোদপুর, হুগলী) ৩৫। তাপস রায় (মহাপ্রভু-পাড়া, নবদ্বীপ) ৩৬। নবকুমার চ্যাটার্জি (কলকাতা-৩) ৩৭। গৌতম মিত্র (কলকাতা-২৬) ৩৮। বিপাশ কুরী (কৃষ্ণনগর, নদীয়া) ৩৯। অনিল দেববর্মা (বাইজালবাড়ী, পঃ ত্রিপুরা) ৪০। দেবপ্রীতি পাল (কলকাতা-৫৪) ৪১। রুদ্রপ্রসাদ চ্যাটার্জি (জলাঘাটা, হুগলী) ৪২। বিমানকুমার মণ্ডল (কলকাতা-৮৮) ৪৩। অরুন্ধতী বিশ্বাস (জামশেদপুর, বিহার) ৪৪। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সগ্রাভাই, বর্ধমান) ৪৫। শান্তনুশঙ্কর দাস (কলকাতা-১২) ৪৬। অনামিকা সিংহ (কৈলাশহর, উঃ ত্রিপুরা) ৪৭। প্রতাপ আচার্য (কাছাড়, আসাম) ৪৮। শ্যামসুন্দর চৌধুরী (বদরপুর, করিমগঞ্জ) ৪৯। অর্ধেন্দুবিকাশ পাত্র (বাঁশীডি, বাঁকুড়া) ৫০। অভিজিৎকিশোর মুখোপাধ্যায় (কলকাতা-৪৫)।

শব্দশৃঙ্খল (শারদীয়) লটারির বিচারক ছিলেন মুকুল গুহ (কলকাতা-৫৪)।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩। ফোন : ২৪-০১৯৯ । থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনকলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭১ থেকে প্রকাশিত।


ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে
सुपर
रिन
सफ़ेदी की चमकार
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

PARIBARTAN 20—26 November 1985 Regn. No. 32815/78 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 3.00

